সাহারার সন্ত্রাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

সেপ্টেম্বর
১৯৬৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

উপহার

শ্রদ্ধেয় ছোটমামা
মহম্মদ ইউনুস আলিকে—
শৈশবে যাঁর কাছে গল্প শুনেই
আমার গল্প লেখার
হাতেখড়ি॥

॥ এক ॥

হরিণমারা সত্যি বড় মজার জায়গা। হিরণমামা যেমনটি লিখেছিলেন, ঠিক তেমনটি। কত সব অদ্ভুত-অদ্ভুত লোক না এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও দেখার মতো। সোনালী বালি ভরা ছোট্ট নদীতে এখন বসন্তে ঝিরঝিরে একফালি স্বচ্ছ জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পাড়ের ঘন গাছপালার রঙ ঝকঝকে ফিকে সবুজ। লাল লাল ফুল ফুটে আছে শিমুলে, কৃষ্ণচূড়ায়, মন্দারে। ওপাশের মাঠে লাল পলাশফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। আর কতরকম পাখপাখালি না আছে এখানে! মনে হয়, চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে স্বস্তির কথা, আজকাল আর বাঘভাল্লুক নেই। কদাচিৎ দুচারটে শেয়াল রাত-বিরেতে ডেকে ওঠে, এই যা।

আর ভূত? হুঁ, ভূত। গতরাতে যা দেখেছি, এখন ভাবতে ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে। কিন্তু হিরণমামাকে বলতে লজ্জা করে। শুনলেই তেড়েমেড়ে বলবেন—তুই তো এমন মিথ্যুক ছিলি নে টিটো। এমন ভীতুও তো ছিলিনে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে অমন অখদ্যে আমাজনের জঙ্গলে-জঙ্গলে তুই কাটিয়ে এসেছিস জংলী জিভারোদের মধ্যে। কোথায় গেল তোর সেই সাহস? ছ্যা ছ্যা! তুই এই হরিণমারার মাঠে ভূত দেখে ফেললি।

তা ঠিকই। আমাজনের অরণ্যে সেবার হিরণমামার পাল্লায় পড়ে সে এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল বটে।* অমন ভয়ঙ্কর জায়গায় কিন্তু ভূতপ্রেত দেখিনি, বড়জোর 'ঢুণ্ডা' নামে একটা দানো দেখতে পেয়েছিলাম। সেটা অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীমাত্র।

---

* লেখকের 'আমাজানের অরণ্যে' নামে এ্যাডভেঞ্চারের বইতে সে কাহিনী আছে।

এবার হরিণমারায় এসে সন্ধেবেলায় আচমকা ভূত দেখতে পাব, ভাবতেও পারিনি।

তার আগে গোড়ার কথাটা বলে নিই।.....

হরিণমারা মুর্শিদাবাদ জেলার একটা গ্রাম। গ্রামের পাশে ওই নদীটার নাম ঝুমকো। কী সুন্দর নাম। ঝুমকোর একপাড়ে উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধের ওপাশে প্রায় চৌদ্দ একর জমি কিনে সম্প্রতি হিরণমামা একটা ফার্ম খুলেছেন। সেখানে যান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত চাষবাস, ফিশারি, পোলট্রি এসব নিয়ে মেতে উঠেছেন। তার সঙ্গে ওঁর অদ্ভুত-অদ্ভুত গবেষণাও চলছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে বিদঘুটে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসে দেখে শুনে মনে হয়েছে, হিরণমামার পায়ে এতদিনে যেন গাছের মতো শেকড়-বাকড় গজিয়ে গেছে। আর কস্মিন্‌কালে রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পৃথিবীর দুর্গম সব জায়গায় পাড়ি জমাতে এতটুকু ইচ্ছে নেই।

এবার শীতের শেষদিকে কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলা বসেছিল। সেই সময় হঠাৎ হরিণমারা থেকে হিরণমামার চিঠি পেয়েছিলাম। বইমেলায় বিদেশী বইয়ের দোকান ঢুঁড়ে একটা বই আমাকে কিনে নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে তাঁর হরিণমারা ফার্মে।

বইটার নাম 'দি আদার ওয়ার্ল্ড'। লেখক এ্যালবার্ট ব্রুস। বইমেলার প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে কী কষ্টে যে বইখানা কিনেছিলাম, আমিই জানি।

তারপর বইটা খুলে অবাক। রাজ্যের কীটপতঙ্গের রঙীন ছবি আর তাই নিয়ে লেখা বই। হিরণমামা হঠাৎ পোকামাকড় ফড়িঙ-টড়িঙ নিয়ে মেতে উঠলেন কেন কে জানে! পরে মনে হয়েছিল, সম্ভবত ফসলের ওপর ওদের হামলা রুখতেই কোনও কীটনাশক ওষুধ আবিষ্কার করতে চান। তাই ওদের হালহদিস জেনে নেবেন। শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শত্রুর পরিচয়টা ভালভাবে জানা দরকার বইকি।

বই কিনে হরিণমারা যেতে কয়েকটা দিন দেরী হয়েছিল। হঠাৎ সর্দিজ্বর। ইতিমধ্যে হিরণমামার ফের একটা চিঠি এল। কড়া তাগাদা। তার সঙ্গে নানারকম প্রলোভন। '...টিটো, হরিণমারা দারুণ মজার জায়গা। এসেই দেখবি, কত বিদঘুটে মানুষ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাজনের অরণ্যের আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান কিংবা জংলী আদিম মানুষদের চেয়েও রহস্যময় সব মানুষ। ঝটপট চলে আয়। হাওড়া স্টেশনে ভোর পাঁচটা পনেরয় ট্রেন। পৌঁছবি বিকেল তিনটে নাগাদ। এ লাইনে ট্রেনগুলো খুব ঢিমে তালে চলে। সেও এক মজার। সেই আদ্যিকালের ভুসকালো এঞ্জিন। জল খেতে একটা ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। কামরাগুলো রঙচটা এবং রগচটা বুড়ো মানুষ। চললে হাড় মটমট করে। কাটোয়া পেরুলে দেখবি, দুধারে রুক্ষু দিগন্তজোড়া মাঠ ধু ধু করছে। আর তার মধ্যিখানে দু একটা ঢ্যাঙা শিমুল মাথায় লাল ফেট্টি জড়িয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে একটা করে ঘূর্ণী হাওয়া চলেছে কোণাকুণি। তার মাথায় খড়কুটো শুকনোপাতা আর সাপের খোলসের আজব টুপি। দেখলে তাক লেগে যায় রে টিটো। তারপর হরিণমারায় নেমে দেখবি এক সব পেয়েছির দেশ।...'

হুঁ, সব সত্যি! স্টেশনে হিরণমামার জিপের ড্রাইভার আরশাদ অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে গোড়ালিতে আওয়াজ তুলে একখানা সেলাম দিয়ে যথারীতি বলেছে, 'ওয়েলকাম মার্শাল টিটো!'

আরশাদ একসময় মিলিটারীতে ছিল। মামার কলকাতার বাড়িতে সে ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িটা চালাতো। সেটা বেচে মামা জিপ কিনেছেন। পথে আসতে আসতে আমুদে আরশাদ অনেক খবর দিয়েছিল। হিরণমামা পোলট্রি করার পর থেকে নাকি এলাকায় আবার শেয়ালের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। মাঝরাতে খটাস নামে কোন প্রাণী একডজন বিদেশী মুরগির ডিম চুরি করতে এসে দিশী কুকুর ঢাকুকে বেজায় হেনস্থা করে গেছে। পুকুরে দিশী কইমাছের সঙ্গে

মারকিন কই অর্থাৎ তেলাপিয়ার মিশ্রণ ঘটিয়ে যে নতুন মাছগুলো জন্মেছে, তারা রাতদুপুরে ব্যাঙের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান গায়। ফার্মের কোণার দিকে একটা তালগাছ আছে। সে রাতে হয়েছে কী, তার ডগায় কোরাস্ গান শুনে ফার্মের কর্মচারীরা অবাক। হিরণমামা তখন ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ওঠানো হয়েছিল। গিয়ে বুঝলেন, পুকুরের নতুন জাতের তাবৎ কইমাছ উঠে গেছে তালগাছের ডগায় এবং মনের সুখে গান ধরেছে। ঢাকুর তাতে বেজায় আপত্তি। তবে সমস্যাটা হল, এর পর দূরের বিলাঞ্চল থেকে উদবেড়ালেরা না টের পেয়ে আনাচে-কানাচে এসে ওৎ পাতে!

আরশাদের এসব কথা শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম। তারপর তো কাল থেকে একের পর এক বিদঘুটে কাণ্ড দেখে যাচ্ছি। যত বিদঘুটে কাণ্ড হিরণমামার, তত এখানকার লোকজনের। যেমন ওই মুকুন্দ—যে ফার্মে ট্রাকটার চালায়। মুকুন্দের গোঁফ চাঁছা, এদিকে চিরকুটে একটুখানি ছাগলদাড়ি ছুঁচলো হয়ে পেট অব্দি নেমে গেছে। ট্রাকটারের স্টিয়ারিঙে বসে সে দাড়ির ডগাটা কখনও বাঁ কানে কখনও ডান কানে জড়িয়ে রাখে। জিগ্যেস করলে বলে—এতে কানের শ্রবণক্ষমতা বাড়ে।

রাঁধুনী বুড়োর নাম হারাধন। তার টিকিটি হাতখানেক লম্বা। টিকির ডগায় তিনটে জবা ফুল বাঁধা। জিগ্যেস করলে বলেছে—শরীরের ত্রিদোষ নষ্ট হয় এতে।

দারোয়ান দাতুয়ার সিং খৈনির বদলে কয়লাগুঁড়ো, চুণ আর মধু হাতের তেলোয় চটকে খায়। এর ফলে সে নাকি ঘুমিয়েও দিব্যি জেগে থাকে।

আরও অনেকের অনেক ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এসব পরামর্শ কে দিয়েছে? খোঁজ করে জানলাম, তিনি এক কোবরেজ মশাই। হরিণমারা গ্রামের শেষ দিকটায় বাড়ি। নাম গোবিন্দমোহন গুপ্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। তিনি আবার জ্যোতিষচর্চাও করেন। ভূত ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পান। আমাকে দেখেই

বলেছেন—হিরণবাবু, আপনার ভাগ্নেবাবাজীকে এক রতি বৈদূর্যমণি পরিয়ে দেবেন। রাহু আর মঙ্গল দুই কোণা থেকে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আর ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, বায়ুদোষ ঘটেছে। হ্যাঁ গা ছেলে, রাত্তিরে উড়ে বেড়ানোর স্বপ্নটপ্ন দেখ বুঝি?

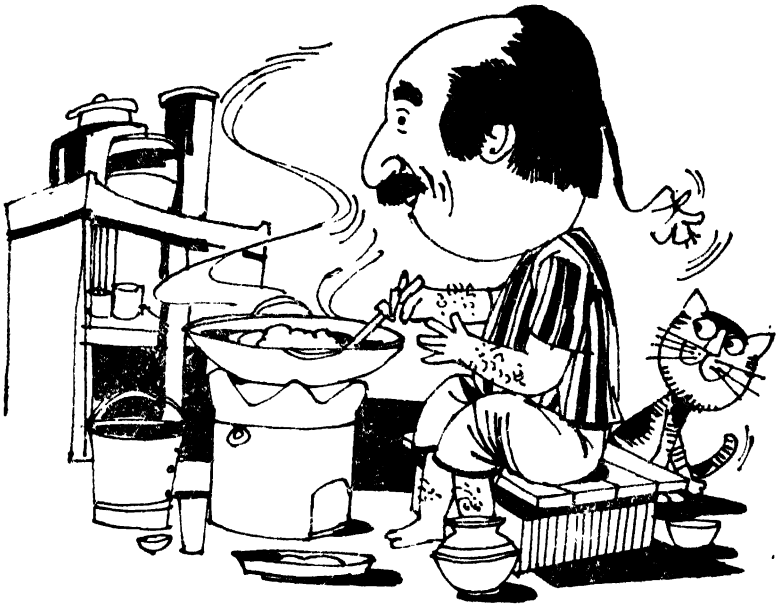

রাঁধুনী বুড়োর নাম হাবাধন! তার টিকিটি হাতখানেক লম্বা। [পৃঃ ৪

তা উড়ি বইকি! স্বপ্নে ওড়াউড়ির অভ্যেস আমার আছে। গোবিন্দ কবিরাজ আমাকে বৃহৎ শকুনাদ্য পাচন দিয়ে যাবেন। শকুনের ডিম, শিশির আর ঘেঁটুফুলের মধু দিয়ে তৈরী। খেতে নাকি সুস্বাদু।

হিরণমামা এঁদের নিয়ে দিন কাটান। আজ সকালে রোগা টিঙটিঙে ঘোড়ায় চেপে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ফর্সা ধপধপে গায়ের রঙ। মাথায় শোলার টুপি। হাবাধন বলেছিল, তোরাপ ডাক্তার। মোরগমুরগির অসুখে ইন্‌জেকশান দিতে এসেছেন। তবে শুধু মোরগমুরগি কেন, হাতিঘোড়া গরু ছাগলের যেমন, তেমনি মানুষেরও চিকিৎসে করেন।

হিরণমামার সঙ্গে কথা বলছেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই তোরাপ ডাক্তার বললেন—হিরণবাবু, এ ছেলেটিকে তো চিনতে পারলুম না।

মামা আমার পরিচয় দিলেন। তারপর তোরাপ ডাক্তার হঠাৎ আমাকে বেমক্কা টেনে পেট টিপতে শুরু করলেন। কাতুকুতু লাগছিল। হিরণমামা ধমক দিলেন—আহা! হাসছ কেন? দেখতে দাও! কলকাতায় তো খালি পেটের অসুখ। এখানে আসার পর আমার সতের বছরের আমাশা নির্মূল হয়ে গেছে। তোরাপ সাহেবের চিকিৎসায়।

তোরাপ ডাক্তার আমার পেটে আরও খামচাখামচি করে বললেন—না, না। ওকে হাসাচ্ছি! হাসো, হাসো তো বাবা। হি হি করে হাসো। প্রচুর হাসো।

অমন কাতুকুতু খেলে প্রচুর কেন, পিলেফাটা হাসি না হেসে পার নেই। তো শেষে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ডাক্তার সাহেব আমাকে হাসিয়ে আমার পেশী ও শিরা-উপশিরার জোর পরীক্ষা করে নিলেন। শেষে প্রেসক্রিপশান লিখতে বসলেন। পুরো ফুলস্কেপ একপাতা প্রেসক্রিপশান। ওষুধ অবশ্যি ওঁর কম্পাউণ্ডার তৈরী করে দেবে। কিন্তু প্রেসক্রিপশানের দিকে তাকিয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকল।

ঘণ্টা নামে ছেলেটি হিরণমামার ছোটখাট ফাইফরমাস খাটে। সে দুপুর নাগাদ এক বিরাট বোতলে কালো রঙের মিকশ্চার এনে দিল। হিরণমামা মুচকি হেসে বললেন—খেয়ে ফ্যাল টিটো। তোরাপ সাহেবের মিকশ্চার খেলে পেশীর জোর বাড়বে। রক্ত চলাচল চমৎকার হয়ে যাবে। তখন আমাজনের জঙ্গল কেন, আণ্টার্কটিকা ঘুরে আসতে একটুও কষ্টও হবে না।

ছিপি খুলে নাকে যে গন্ধ পেলুম—। আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার অবস্থা।···বোতলটা তক্ষুনি বন্ধ করে বললুম—মামা। এর চেয়ে গোবিন্দ কবিরাজের বৃহৎ শকুনাদ্য পাচন এনে দিন, খাচ্ছি! এ আমি কিছুতেই খেতে পারব না। ফেলে দিচ্ছি।

হিরণমামা হেসে বললেন—সর্বনাশ। তোরাপ ডাক্তার যদি টের পান, ওষুধ ফেলে দিয়েছিস, কেলেঙ্কারী করে ছাড়বেন। বরং এক কাজ করা যাক্।

বলে উনি ওঁর প্রিয় কুকুর ঢাকুকে ডাকলেন। ঢাকু ফার্মের এই একতালা বাংলো বাড়ির সামনে লনে বসে আকাশ দেখছিল। দৌড়ে এল। মামা বললেন—হাঁ কর্ তো বাবা ঢাকু।

আশ্চর্য, ঢাকু হাঁ করল আর মামা ওঁর মুখে বোতলের পুরো ওষুধ ঢেলে দিলেন। ঢাকু একটুও আপত্তি করল না। বরং মানুষের মতো ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল সবটা। বোতলের শেষ ফোঁটাও তার চাই। জিভ বের করে বোতলের মুখও চেটে দিল।

হিরণমামা বললেন—দেখলি? তোরাপ ডাক্তারের ওষুধ খেতে খুব ভালবাসে ঢাকু। ওদিকে গোবিন্দ কবরেজের রকমারি বড়ি আর পাচন, তাও চেটেপুটে খায়। সবচেয়ে খেতে ভালবাসে ছাগলাদ্য ঘৃত।

বললাম—যাক্‌গে। তাহলে শকুনাদ্য পাচনের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, মামা।

—আলবাৎ হবে। তুই ভাবিসনে।

ঢাকু ওষুধটা খেয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে ছুটল বারান্দার দিকে। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না।

দেখে নিয়ে হিরণমামা বললেন—স্ফূর্তি বেড়ে গেল ঢাকুর। দেখলি তো? এখন সারা ফার্ম চক্কর দিয়ে দৌড়ে বেড়াবে, যতক্ষণ না ওষুধটা হজম হচ্ছে, ততক্ষণ ছুটোছুটি না করলে তো চলবে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পাশের ঘরে শুতে গেলুম। মামা থাকেন ওঁর ল্যাবরেটরি-কাম-ড্রয়িং রুমে। ওখানেই বাইরের কেউ এলে কথা বলেন। বিশ্রাম করেন। পড়াশুনো করেন। রাতে ওঘরেই শোন। মামারবাড়ির তিনদিকে মাঠ, বিল আর অল্পস্বল্প জঙ্গল, একদিকে নদী। নদীর ওপারে হরিণমারা গ্রাম। একটু দূরে নদীর ওপর ব্রীজ আছে। ওটাই পাকা রাস্তা। ব্রীজ পেরিয়ে

নদীর ধারে ধারে বাঁধের পথে এই খামারবাড়ি আসা যায়। পাকা রাস্তাটা এই মাঠের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে দক্ষিণে চলে গেছে শহরের দিকে।

উপুড় হয়ে শুয়ে জানলায় চোখ রেখে পূবের মাঠের ওদিকে জঙ্গলগুলো দেখছিলাম। কাল রাতে ওখানেই নদীর ধারে ভূত দেখেছিলাম। ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিনে। ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা আমার দেখার ভুল নয় তো?

কাল পূর্ণিমা ছিল। সন্ধ্যার পর আনমনে একা ঘুরতে ঘুরতে বাঁধ বরাবর ওদিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। হিরণমামা সাবধান করে দিয়েছেন, এখানে সাপের উপদ্রব আছে। ভুলে গিয়েছিলাম। অত বড় একটা চাঁদ, তার সোনালী জ্যোৎস্না আর নিঝুম নিরিবিলি জায়গা। এক বিচিত্র নেশায় মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই গভীর স্তব্ধতা কলকাতায় কল্পনা করা যায় না। কবছর আগে ব্রাজিলের আমাজন নদীর ধারে যে আদিম অরণ্যে জ্যোৎস্নারাতে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার স্মৃতি আমাকে নাড়া দিচ্ছিল। কল্পনা করছিলাম, এখনই আমার জিভারো বন্ধুরা হঠাৎ এসে পড়ে চেঁচিয়ে উঠবে: দ্রাকামা তাসাংগু! আমরাও এসে পড়েছি! দ্রেকচু তিসা দিরললা! তুমি কি আমাদের ভুলে গেছ হে তরুণ বন্ধু?

জঙ্গলটার কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। কোথায় কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার সুরে গান করছে। এমন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কি কোনও মানুষের হতে পারে? অনেক পোকামাকড় আছে, যাদের ডাক শুনলে মনে হয় মাথার ভেতর থেকেই যেন ডাকছে—এ তেমনি।

বাতাস বইছিল জোরে। তাই গানের শব্দটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল—কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলুম, এদিকে তো বসতি নেই শুনেছি। ছ'মাইল দূরে রেললাইন অব্দি টানা জঙ্গল, তৃণভূমি আর নদী খাল বিল। বেশ দুর্গম এলাকা। এমন জায়গায় চাষবাসও বিশেষ হয় না। এখানে কে এমন সময় গান গাইতে আসবে?

নাকি ওটা গান নয়, কান্না? কেউ মনের দুঃখে নির্জনে এমন করে কাঁদতে এসেছে? কৌতূহল জাগল বলেই শব্দটা কোত্থেকে আসছে, ঠাহর করার চেষ্টা করলুম। তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমার সামনে বাঁদিকে নদীর তলায় এক ঝলক আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। আগুনে অজস্র স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। কেউ তুবড়িবাজী পোড়াচ্ছে নাকি? আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। তুবড়িবাজীর আগুন অন্তত কয়েক মিনিট থাকে। এ আগুনটা বড়জোর আধ মিনিট ছিল। আর তার ছটায় দেখলুম একটা ছায়ামূর্তি চারদিকে হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরার চেষ্টা করছে আর মুখে পুরছে।

সেই গানটা তখন আর শুনতে পাচ্ছি না। ব্যাপার দেখে আমি তো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। তারপর আগুনটা নিভে গেল। স্ফুলিঙ্গগুলোও শেষবারের মতো ছড়িয়ে পড়ল। তারপর দেখলুম জ্যোৎস্নায় নদীর চরে সেই কালোমূর্তিটা ফের অস্বাভাবিক ক্ষীণ স্বরে গান গাইছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। আমি শব্দের ভয় তুচ্ছ করে ঝোপঝাড় ঠেলে হুড়মুড় করে নদীতে নেমে গেলুম। আগেই বলেছি, নদীর তলায় বালির চড়া পড়েছে। একপাশে একফালি ঝিরঝিরে স্রোত বইছে, তাতে পায়ের পাতাটুকু ডোবে মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য, নদীর চড়ায় কেউ নেই। গানটাও বন্ধ হয়ে গেছে ফের। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে খুঁজে বেড়ালুম। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলুম—কে? কে আছ এখানে? কোনও সাড়া এল না। ঘোর স্তব্ধতায় শুধু বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝোপঝাড় গাছপালা দুলছে। আকাশে মস্তো চাঁদ থেকে সোনালী কুঁজোর জল গড়িয়ে পড়ার মতো জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আমার গায়ে কাঁটা দিল। তাহলে কি ওটা ভূতপ্রেত?

কাঁপাকাঁপা গলায় ফের খুব জোরে চেঁচিয়ে বললুম—কে? কে আছ এখানে?

এ নেহাৎ নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্যেই। ততক্ষণে পালানোর ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসেছে। নদী থেকে পাড়ে উঠে গেলুম। তারপরই ভয়টা আচমকা বেড়ে গেল। অমনি বাঁধের পথে প্রায় দৌড়ে চললুম।

ফার্মের কাছে গিয়ে সাহস ফিরে এল। বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বাঁধ থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম। এবার নিজের কাছেই লজ্জা! ওই সামান্য ব্যাপারটা দেখেই আমার ভয় হল কেন? যে শুনবে, সে হয়তো আমার ভীরুতায় হো হো করে হাসবে। এমন কী, তুবড়ি পোড়ানো ভূতের ব্যাপারটা আমার বানানো বলে ঠাট্টা করবে!

এই সব ভেবে কাকেও কথাটা বলিনি। হিরণমামা একবার জিগ্যেস করেছিলেন—কী রে? তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন? বলেছিলুম—ট্রেনজার্নিতে ক্লান্ত।

আজ সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে আকাশপাতাল হাতড়েছি। যা দেখেছি, তা কি চোখের ভুল? এখন দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াতে এসেছি। বাইরে এখনই গ্রীষ্মের আভাস। উজ্জ্বল রোদ ঠিকরে পড়ছে। বেশ গরম লাগছে। তবে খামার বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে। মাঠে এগারো হাজার ভোল্টের লাইন গেছে। সেখান থেকে ট্রান্সফর্মার বসিয়ে হিরণমামা বিদ্যুৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাই শহরের আরাম এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সত্যি বলতে কী, রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি! একে নতুন জায়গা, তাতে সেই ভৌতিক রহস্য।

ঘুম ভাঙল ঘণ্টার ডাকে। সে চা এনেছে। চা পাশের টেবিলে রেখে বলল—ছোটবাবু, চা খেয়ে বড়বাবু আপনাকে যেতে বললেন!

ঘণ্টা আমাকে কাল থেকে ছোটবাবু বলে ডাকছে। এখানে সবাই হিরণমামাকে বড়বাবু বলে। বললাম—তোমার বড়বাবু এখনও মাঠে নাকি!

হিরণমামাকে দুপুরে খাওয়ার পর মাঠে যেতে দেখেছিলাম। মাথায় টুপি, পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে গামবুট পরা। হাতে একটা স্প্রে-যন্ত্র। গমে কীটনাশক ওষুধ ছড়াতে যাচ্ছিলেন নিশ্চয়।

ঘণ্টা জবাব দিল—এজ্ঞেঁ না ছোটবাবু! মাঠ থেকে কখন ফিরেছেন। পাশের ঘরে পোকা বাছছেন।

বলে হাসতে হাসতে সে চলে গেল। পোকা বাছা মানেটা কী বুঝলুম না। চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় গেলুম। বাইরে রোদের রঙ লালচে হয়ে উঠেছে। গাছপালায় অসংখ্য কোকিল চেঁচামেচি করছে। একটা মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে গেল হঠাৎ। টের পেলুম আমের মুকুলের গন্ধ। ফার্মের কোণার দিকে পুরনো আমলে জমিদারের লাগানো একটা আম গাছ আছে। এ জমিজায়গা গাছপালা সবই সেই জমিদারের উত্তরাধিকারীদের কাছে হিরণমামা কিনেছেন।

মামার ঘরে ঢুকে দেখি, উনি একটা ঝকঝকে কাচের ট্রেতে একগুচ্ছের মোটাসোটা গড়নের মরা ফড়িঙ নিয়ে চিমটের সূক্ষ্ম ডগা দিয়ে ফুটিয়ে কী সব দেখছেন। জিগ্যেস করলুম—ওসব কী মামা?

হিরণমামা মুখ তুলে হাসলেন।—এই মোড়াটায় বস্ টিটো। তোকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করব।

এই সেরেছে! এবার তো চুপচাপ বসে নির্ঘাৎ পোকা-মাকড়ের জ্ঞান গিলতে হবে। আপত্তির সুযোগই পাব না। হুঁ, পেলুম না। হিরণমামা আমাকে টেনে মোড়ায় বসিয়ে বললেন—এই যে ফড়িঙগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় শোন্।

না শুনে উপায় কী? ঘাড় নাড়লুম লক্ষ্মীছেলের মতো।

হিরণমামা বললেন—কীটপতঙ্গের কয়েকটা শ্রেণী আছে। যেমন: এফোমেরোটেরা, গিলোব্যাটোড়িয়া, ফ্যাসমিডা, অর্থোটেরা

ইত্যাদি। এই ফড়িঙগুলো অর্থোটেরা শ্রেণীর। এদের মধ্যে যাদের শুঁড় লম্বা, তাদের বলে টেট্রিগণিও ইডিয়া। যাদের শুঁড় ছোট্ট, তারা এ্যাক্রিডোইডিয়া। কেমন?

ফের মাথা নাড়লুম।

—দেখতে পাচ্ছিস, এদের শুঁড় ছোট। এরা এ্যাক্রিডোইডিয়া গোত্রের পতঙ্গ। এদের বৈজ্ঞানিক নাম কী জানিস? সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া। এরা আসলে পঙ্গপাল।

মরা ফড়িঙ নিয়ে চিমটের সূক্ষ্ম ডগা দিয়ে ফুটিয়ে কী সব দেখছেন। [পৃঃ ১১

শুনে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম—এক্সরসিস্ট নাম্বার টু!

হিরণমামা চোখ কপালে তুলে বললেন—সে কী রে?

বললুম—হ্যাঁ, মামা। সেদিন নিউ এম্পায়ারে ওই দেখেছি যে। ওতে আফ্রিকার মাঠে পঙ্গপাল পড়ার দৃশ্য আছে। নিগ্রোদের বিশ্বাস, পঙ্গপালের রাজা এক সাংঘাতিক ভূত। সে মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে।

হিরণমামা হো হো করে হেসে উঠলেন—এক্সরসিস্ট নামে প্রথম ছবিটা আমি দেখেছিলুম।

ভূতপেরেতের কাণ্ড!

বললুম—দুনম্বরটাত ভূতপেরেতের কাণ্ড, মামা।

হিরণমামা গম্ভীর মুখে বললেন—সায়েবদের হল কী বল্‌তো টিটো? মধ্যযুগের লোকের মতো আবার ভূতপেরেত নিয়ে মাথা-ঘামাতে শুরু করলে কেন? এই মহাকাশ-যুগে বিজ্ঞানের আলো যত উজ্জ্বল হচ্ছে, তত যেন একটা কালো ছায়াও তার তলায় ঘন হয়ে জমে উঠেছে। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের ছায়া। বিজ্ঞানের তলায় এসে জুটছে অপবিজ্ঞান। বিজ্ঞানেরই মুখোস আঁটা তার মুখে। বোকাদের ঠকাচ্ছে।

বলে উনি কী যেন ভাবতে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে সুদৃশ্য কালো কুচকুচে দাড়ি ও গোঁফের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে ফের বললেন—মরুক গে ছাই। আমার মাথায় অন্য চিন্তা। টিটো, হরিণমারার মাঠে তো ইদানীং পঙ্গপালের ঝাঁক হানা দেয় নি। তাহলে এগুলো কীভাবে পেলুম, নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে।

—তা করছে বটে! অগত্যা কথাটা না বলে পারলুম না।

হিরণমামা খুশি হয়ে বললেন—এই তো চাই! সব কিছুতে আগ্রহ আছে বলেই না তোকে আমি এত পছন্দ করি। শোন্ তবে। এই ফড়িঙগুলো আমি সাহারা মরুভূমি অঞ্চল থেকে সম্প্রতি আনিয়েছি। এই ফার্মের জমি যার কাছে কিনেছি, তিনি এখানকার একসময়ের জমিদারবংশের লোক। নাম মণিশংকর চৌধুরী। এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর ছোট ছেলে প্রদীপশংকর থাকেন আলজিয়ার্সে—আলজিরিয়ার রাজধানীতে। তিনি একজন ভূতত্ত্ববিদ। আলজিরিয়ার দক্ষিণ এলাকায় সাহারা শুরু হয়েছে। রুক্ষ মরু অঞ্চলকে কীভাবে বসবাসের যোগ্য করা যায়, তাই নিয়ে সেখানকার সরকার অনেক পয়সা খরচ করছেন। দেশবিদেশের বিজ্ঞানীদের

নিয়ে গেছেন। তো প্রদীপশংকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে চিঠিতে।

বললুম—উনিই তাহলে ফড়িঙগুলো পাঠিয়েছেন!

হিরণমামা হঠাৎ এদিকওদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললেন—এখানে ফার্ম করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, টিটো! কীট-পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা। এই সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়াকে বলা হয় ডেজার্ট লোকাস্ট। মরুভূমির পঙ্গপাল। এদেরই ক্ষুদে এক প্রজাতি এদেশের মাঠে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা বলি ঘাসফড়িঙ। এইসব ফড়িঙ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ এক সাংঘাতিক ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছি। ক্ষুদে দিশী ঘাসফড়িঙগুলোর পেটে একরকম বিষাক্ত জিনিস আছে। তা বেশিমাত্রায় মানুষের পেটে গেলে কলেরা হবে। কিন্তু অল্পমাত্রায় তা নেশার কাজ করবে।

বলে হিরণমামা খিকখিক করে হাসলেন। হাসির কারণ বুঝতে পারলুম না। বললুম—হাসছেন কেন মামা?

হিরণমামা হাসতে হাসতে বললেন—কথাটা সেদিন দৈবাৎ মুখ ফসকে গোবিন্দ কবরেজকে বলে ফেলেছিলুম। উনি আবার আফিঙ্খোর মানুষ। রোজ সন্ধ্যায় ভরিটাক আফিঙ চাই-ই। প্রায় দুঃখ করে বলেন, আফিঙের যা দর বেড়েছে। এবার আফিঙের অভাবে নির্ঘাৎ মারা পড়তে হবে। তাই আমি বলে ফেলেছিলুম, কবরেজমশাই, ঘাসফড়িঙ ধরে খাবেন বরং। ওদের পেটে আফিঙের মতোই নেশার জিনিস আছে। ব্যস! উনি তো লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সত্যি নাকি বড়বাবু? তারপর ঘণ্টা আমাকে সেদিন বলল, গোবিন্দ কবরেজ মাঠে মাঠে ফড়িঙ ধরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আজকাল কীটনাশক বিষের চোটে ফড়িঙ কমে গেছে। যারা আছে, তারা দিনমান ভরে গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাতবিরেতে চরতে বেরোয়। তাই কবরেজ মশাই নাকি রাত্রিবেলা আগুন জ্বেলে···

এ কাণ্ড শুনেই আমি লাফিয়ে উঠে বললুম—মামা! মামা! ইউরেকা।

হিরণমামা অবাক হয়ে বললেন—ইউরেকা কী রে ?

বললুম—কাল সন্ধ্যায় নদীর ধারে তাহলে ভূতপ্রেত নয়, গোবিন্দ কবরেজকেই দেখেছি। ভূতরহস্য ফাঁস হয়ে গেল মামা।

হিরণমামা ধমক দিয়ে বললেন—খুলে বল্ না হতভাগা !

কাল সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা এবার খুঁটিয়ে বললুম। শুনে হিরণমামা হো হো করে এত জোরে হাসলেন যে বাইরে ঢাকু বেজায় আপত্তি করে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল।

হুঁ, সব জল হয়ে গেল। কবরেজমশাই তাহলে আগুন জ্বেলে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফড়িঙ ধরে খাচ্ছিলেন। আগুন জ্বাললেই তো পোকামাকড় ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে। তারপর আমার উপস্থিতি টের পেয়েই হয়তো লজ্জা পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ওঁর নাকীসুরের ক্ষীণ গানটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত। কী গান, পরে জেনে নেব।

ততক্ষণে রোদ কমে এসেছে বাইরে। পাখিরা গান গেয়ে সূর্যদেবকে বিদায় জানাচ্ছে। হিরণমামা জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন—কবরেজমশাই শেষে মারা না পড়েন।

আফিঙখোরদের অনেক গল্প আমার পড়া। তাই বললুম—না মামা। কবরেজমশাই অত সহজে মারা পড়বেন না। আফিঙখোরদের গোখরো সাপে কামড়ালেও নাকি কিস্যু হয় না। ও তো ঘাসফড়িঙ !

হিরণমামা বললেন—হ্যাঁ। তাও বটে। তবে যা বলছিলুম, শোন্। ক্ষুদে দিশি ফড়িঙের পেটে যদি এমন সাংঘাতিক ড্রাগ লুকোনো থাকে, তাহলে ওদের মূল প্রজাতি মরুভূমির পঙ্গপাল ওই সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়ার পেটেও নিশ্চয় আছে। বেশি করেই আছে। সেটা পরীক্ষা করার জন্য প্রদীপশংকরকে লিখেছিলুম, এই ফড়িঙগুলো শিগগির পাঠান। তারপর দেখি, সাংঘাতিক ব্যাপার !

—কী সাংঘাতিক ব্যাপার, মামা ?

আমার প্রশ্ন শুনে হিরণমামা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর

তখনকার মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন—সাবধান টিটো, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন জানতে না পারে। একটা সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়ার পেটে যতটুকু বিষ আছে, তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ টাকা দামের নিষিদ্ধ মাদক তৈরি করা যায়। আমি ইচ্ছে করলেই এখন গোপনে ওই বেআইনী মাদকের কারবার করে কোটিপতি হতে পারি। কিন্তু সে তো অন্যায়। সেটা পাপ। পাপের পথে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

হিরণমামার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলুম। একটু চুপচাপ থাকার পর উনি ফের বললেন—কীভাবে ওই বিষাক্ত জিনিস ফড়িঙগুলোর পেট থেকে বের করা যায়, তাও আবিষ্কার করেছি। সেটা না জানা থাকলে কেউ যে ভাবছিস ফড়িঙের পেট টিপে নাড়িভুঁড়ি রস বের করে কাজে লাগাবে, তা হবে না। এর একটা পদ্ধতি আছে। খুব জটিল সেটা। আমি ফর্মুলার আকারে লিখে রেখেছি।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—মামা! কেউ ফর্মুলা চুরি করে যদি নিষিদ্ধ মাদকের চোরাকারবারীদের বেচে দেয়! ওটা লিখে রাখা আপনার ঠিক হয়নি।

এই সময় বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল—কই বড়বাবু, আপনার ভাগ্নেবাবাজী কোথায়?

ঘুরে দেখি, স্বয়ং গোবিন্দ কবিরাজ। হাতে একটা কৌটো। হিরণমামা তক্ষুণি ফড়িঙের পাত্রে ঢাকনা চাপিয়ে দিয়েছেন। বললেন—আসুন, আসুন কবরেজমশাই।

গোবিন্দ কবিরাজ বললেন—এই যে বাবাজী! তোমার জন্যে অনেক কষ্ট করে বৃহৎ শকুনাদ্য পাচন তৈরি করেছি। নাও, এক চামচ সেবন করো। আমার সম্মুখেই সেবন করো। ফলাফল প্রত্যক্ষ করেই যাই।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। সর্বনাশ! শকুনের ডিমের পাচন যে কী জিনিস কে জানে! ওঁর আফিঙের চেয়েও

নিশ্চয় সাংঘাতিক না হয়ে যায় না। হিরণমামা বললেন—নিশ্চয় সেবন করবে। কই, আমাকে দিন। ওকে জোর করে খাইয়ে দিচ্ছি। পাচন কি কেউ এমনি-এমনি খেতে চায়? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তা খাওয়ানোর বিধিও রয়েছে না? এই বলে কবরেজমশাই আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন।

দরজার কাছে ঘণ্টা উঁকি দিচ্ছিল। ওর মুখে মিটিমিটি দুষ্টুর হাসি। আমার করুণ চোখ ওর চোখে পড়তেই সে মাথাটা দোলাল। তারপর সরে গেল। হিরণমামা হাঁকলেন—ঘণ্টা। একটা চামচ নিয়ে আয়!

আর সেই সময় আচমকা শ্রীমান ঢাকু ঘরে ঢুকে গোবিন্দ কবিরাজের পিঠে সামনের দুই ঠ্যাঙ তুলে গররর-র-র শব্দ করল।

কবরেজমশাই অমনি লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—বাঁচাও, বাঁচাও!

হিরণমামা হাসি চেপে কুকুরটার গলার বকলেস ধরে ফেললেন। কবরেজমশাই ছাড়া পাওয়া মাত্র চিড়িংবিড়িং করে নাচের ভঙ্গীতে দৌড়ে বেরুলেন ঘর থেকে।

একটু পরে জানলায় গিয়ে দেখি, উনি বাঁধের দিকে দৌড়চ্ছেন।

হিরণমামা হাসতে হাসতে বললেন—জোর বেঁচে গেছিস টিটো! কিন্তু বৃহৎ শকুনাদ্য পাচনের একটা ব্যবস্থা না করলে তো কবরেজ মশাইয়ের অভিশাপ লাগবে! ঠিক আছে। বাবা ঢাকু, লক্ষ্মীছেলের মতো হাঁ করো তো সোনা!

ঢাকু বিরাট হাঁ করে লেজ নাড়তে থাকল। হিরণমামা কৌটো খুলে সবটাই ঢেলে দিলেন ওর মুখে। শেষটুকু চেটেপুটে খাবার জন্যে সে কৌটাটাও কামড়ে ধরল। তারপর সেটা মুখে নিয়ে বেরুল।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, ঢাকু শকুনের মতো উড়ে বেড়ানোর ভঙ্গী করে মাঠে দৌড়ুচ্ছে।

হিরণমামা বললেন—কবরেজমশাই খুব রেগে গেছেন। পরে

গিয়ে রাগ ভাঙাতে হবে। তা টিটো, আজ বেড়াতে যাবিনে নদীর ধারে? গেলে সঙ্গে টর্চ নিস। আর মুকুন্দকেও নিস বরং।

বললুম—আর আমার ভয় করবে না মামা। ভূতের রহস্য তো জেনেই ফেলেছি। বরং ফড়িঙখেকো কবরেজমশাইকেই ভূতের ভয় দেখাবো।

হঠাৎ ঘণ্টা দৌড়ে এসে বলল—বড়বাবু! টেলিগিরাম এনেছে পিয়ন।

হিরণমামা পা বাড়িয়ে বললেন—টেলিগ্রাম! এই অবেলায়!

॥ দুই ॥

ডাকপিওনের কাছ থেকে টেলিগ্রামটা প্রায় ছিনিয়েই নিলেন হিরণমামা। তারপর লাফিয়ে উঠলেন। রাশভারি দাড়িওয়ালা মানুষকে অমন নাচের ভঙ্গীতে হাত তুলে পা ফেলতে দেখলে কুকুর বেড়ালেরও হাসি পাবে। কিন্তু কবরেজের শকুনাদ্য পাচন খেয়ে তখন শ্রীমান ঢাকু ঢ্যাঙা শিমূল গাছটার তলায় গিয়ে শকুনদের সঙ্গে ডেকে ডেকে আলাপ করছে। অন্যদিকে মন নেই। তবে হারাধন

ডাকপিওনের কাছ থেকে টেলিগ্রামটা প্রায় ছিনিয়েই নিলেন হিরণমামা।

রাঁধুনীর আদরের বেড়ালটা ছিল। তার নাম বিল্লু মিয়া। কিচেনের মাছ-মাংসের সিকিভাগ তার পেটেই যায়। ফলে তার চেহারা হয়েছে পিপের মতো। হিরণমামার নাচ দেখে সে তারিফ করে বলল—মিয়াও! মিয়াও! অর্থাৎ চালিয়ে যাও।

আর মামার মনেও কী ঘোর লেগেছে যেন। সেই ভাবের ঘোরে বিল্লু মিয়াকে বুকে তুলে নিলেন। তারপর দৌড়ুলেন ওঁর ল্যাবরেটরী-কাম-বেডরুমের দিকে। আমি তো অবাক। হিরণমামার হল কী?

ততক্ষণে গাছগাছালির মাথা থেকে রৌদ্দুর মুছে গেছে। ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে হরিণমারার আ-দিগন্ত মাঠে। তালের শাখায় চৈতালী হাওয়া ভূতুড়ে বাজনা বাজাচ্ছে সড় সড় খড় খড় ফড় ফড়াৎ। দিগন্তে রঙীন মেঘের ফালিতে রূপকথার মায়াবী দেশটা উঠেছে ফুটে। ছবির মতো সুন্দর উপত্যকা, নদী, পাহাড়, অরণ্য বেগুনী-নীল-সবুজ-জাফরানী রঙে আঁকা। দেখতে দেখতে মন চলে যায় ওই অসম্ভবের দেশে। আজও যেখানে হয়তো ঘুরে বেড়ায় রাজপুত্র কোমরে তলোয়ার বেঁধে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে।

মনের এই উদাস ভাবটা কেটে গেল হিরণমামার ডাকে। গিয়ে দেখি, উনি বিল্লু মিয়াকে হাঁ করিয়ে মুখে একটা মস্তো ফড়িং ঢোকাচ্ছেন। এতে মিয়াসাহেবের বেজায় আপত্তি। কিন্তু হিরণ-মামার বজ্রআঁটুনি ফস্কে মুক্তি পাওয়ার চান্স নেই।

মামার সামনে টেবিলের ওপর সেই টেলিগ্রাম। ইংরিজীতে টাইপ করা কয়েকটা লাইন। ঝুলন্ত একটা বাল্‌ব থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়েছে ঘরে। ওটা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলুম না। হিরণমামা বললেন—বাঁদরটাকে একটু ধর্‌তো টিটো। সাবধান, যেন আঁচড়ে দেয় না।

অবাক হয়ে বললুম—বাঁদর কোথায় মামা? ওটা তো বেড়াল।

স্বভাবে বাঁদর। বলে হিরণমামা চোখ কটমট করে ধমক দিলেন। হাঁ করে দেখছিস কী?

অগত্যা বিল্লু মিয়ার পিঠ খামচে ধরলুম। আর হিরণমামা সেই মোটা ফড়িংটা ওর মুখে পুরো গুঁজে দিয়ে ওর মুখটা বুজিয়ে চেপে রাখলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আচমকা বেড়ালটা গ্যাঁও করে উঠল।

তারপর কী একটু ঘটল বুঝলুম না। হিরণমামা গেছি রে বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমিও নখের আঁচড় থেকে বাঁচতে এমন ভাব দেখালুম যেন হাত ফসকে গেছে। তখন বিল্লু মিয়া দরজার কাছে চলে গেছে। তার লেজটা গোঁজের মতো সোজা আর শক্ত দেখাচ্ছে। হিরণমামা চেঁচালেন—ধর ধর! বেড়ালটা ততক্ষণে বাইরে গা-ঢাকা দিয়েছে। তারপর দূরে কোথাও মিয়াও ডাক শোনা গেল। সেটা কানের ভুল হতেও পারে।

হারাধন দৌড়ে এসেছিল। তার আদরের বেড়ালকে বড়বাবু হেনস্থা করেছেন আঁচ করে সে গোমড়া মুখে বলল—বড়বাবু, মিয়া সাহেব কি কোনও দোষ করেছিল? করল যদি, আমাকে বললেই হত।

হিরণমামা হাতে এ্যান্টি-সেফ্‌টিক ওষুধ ঢালতে ঢালতে একটু হেসে বললেন—না হারাধন। তোমার মিয়াসাব কোনও দোষ করে নি। আমরা ওকে একটু আদর করছিলুম। কিন্তু তার ফলটা ছাখো, কেমন কামড়ে দিয়ে গেল। কে জানে, বিষিয়ে যাবে নাকি!

একগাল হেসে হারাধন বলল—না বড়বাবু! ওর দাঁতে বিষ নেই। খুব ভাল জাতের বেড়াল।

আমি মুখ ফসকে বলে ফেললুম—তোমার বেড়ালকে আমরা ফড়িং খাওয়াচ্ছিলুম। হারাধনদা!

—এ্যাঁ! ফড়িং খাওয়াচ্ছিলেন? হারাধন চোখ কপালে তুলল। তারপর ফের হাঁউমাউ করে বলল—ওরে বাবা! কোবরেজমশায়ের মতো ফড়িং খাওয়া ধরলে ও যে নেশাখোর হয়ে যাবে! বড়বাবু, আমার এ কী সর্বনাশ করলেন! বিল্লু! বাবা বিল্লু, কোথায় গেলি রে?

তারপর সে দৌড়ে চলে গেল। হিরণমামা আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন—ওকথা বলতে গেলি কোন আক্কেলে?

আমি অপ্রস্তুত। বাম হাতে প্ল্যাস্টিক ব্যাণ্ডেজ এঁটে গম্ভীর মুখে

টেলিগ্রামটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু কেশে বললুম—ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা শুনলেন মামা? কোবরেজমশায়ের ফড়িং খাওয়ার কথা সবাই তাহলে জানে দেখছি!

—হুঁ। তা বুঝতে পারলুম। হিরণমামা আনমনে বললেন।

এবার পাশের চেয়ারে বসে বললুম—টেলিগ্রাম কিসের মামা?

হিরণমামা ফের চাপা গলায় বললেন—মুশকিলটা কী জানিস? তোর পেটে দেখছি কথা থাকে না। যাই হোক এবার আর মুখ ফসকে কারও সামনে কিছু বলিসনে। কিছুদিন আগে ডক্টর ফিলো এরহার্ড নামে এক জীব-বিজ্ঞানীকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম, অর্থোটেরা প্রজাতির কীটপতঙ্গের দেহে কিছুটা মাদক দ্রব্য থাকে। যেসব পাখি বা সাপব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী কীটপতঙ্গ খায়, তাদের নেশা হয় কি না। ডঃ ফিলো তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন এই টেলিগ্রামে। বলেছেন, তা তো হয়ই। তবে বেশী নেশা হয় বেড়ালের।

অবাক হয়ে বললুম—বেড়ালও পোকামাকড় খায় নাকি?

—আলবাৎ খায়। আরসোলা থেকে শুরু করে সব প্রজাতিই কীটপতঙ্গ খায়। আলোর কাছে বেড়াল রেখে পরীক্ষা করতে পারিস! হিরণমামা সোজা হয়ে বসলেন এবার।···কিছুদিন থেকে লক্ষ্য রেখেছিলুম হারাধনের বেড়ালটার দিকে। দেখতুম, প্রায়ই সে লনের ঘাসের মধ্যে ছুটোছুটি করছে প্রজাপতি, গাঙফড়িং বা ঘাস-ফড়িঙের পেছনে। ভাবতুম, নিছক খেলা করছে। কিন্তু না। বিল্লু মিয়া দিব্যি গপ করে গিলেও নিচ্ছে।

হাসতে হাসতে বললুম—জ্যান্ত কীটপতঙ্গ খাচ্ছে বলে তোমার ওই মরা ফড়িংয়ে রুচি থাকবে নাকি বিল্লু মিয়ার!

হিরণমামা বললেন—কে জানে! তবে ফড়িংটা ওকে গেলাতে পেরেছি মনে হচ্ছে। দেখা যাক্, এর ফলাফল কী হয়। এতো দিশী ফড়িং নয়, সাহারা মরুভূমির 'আহাজার' অঞ্চলের পঙ্গপাল। ওখানে 'তুয়ারেজ' নামে যাযাবর উপজাতির লোকেরা থাকে। ওরা বিশেষ

প্রক্রিয়ায় এই ফড়িং থেকে মাদক দ্রব্য বের করে। সন্ধ্যার পর সেই মাদক এক চুমুক খেয়ে ওরা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। প্রদীপশংকরের কথা তোকে বলেছি। উনিই এখবর জানিয়েছেন।

আজ আর আমার বেড়াতে যাওয়া হল না। হিরণমামা র‍্যাক থেকে বিরাট একটা বই বের করে আমাকে ফড়িং-তত্ত্ব বোঝাতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ফের আরেকটা বই টেবিলে এল। সেটা দেখি, সাহারা মরুভূমির মানুষজন নিয়ে লেখা। যাকে বলে নৃতত্ত্বের বই। তার মধ্যে থেকে তুয়ারেজ উপজাতির অধ্যায়টা বের করে পড়তে শুরু করলেন। আমি অসহায়। কানে যাই ঢুকুক, মনে ঢুকছে না। হাই তুলছি আর সায় দিয়ে যাচ্ছি। হরিণমারায় বেড়াতে এসে এত জ্ঞানবিজ্ঞানের পাল্লায় পড়ব ভাবতেই পারিনি। মনে মনে ঠিক করলুম, শিগ্‌গির কেটে পড়তে হবে।

কিন্তু সেই রাতে যা ঘটল, তারপর আমার কেটে পড়ার উপায়ই রহিল না। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।...

হিরণমামার ফড়িং-বিজ্ঞানের চোটে সে-রাতে শুতে প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। শুতে যাওয়ার সময় দেখলুম, কিচেনের ভেতরে হারাধন কী একটা করছে। উঁকি মারতেই চোখে পড়ল, সে তার আদরের বিল্লু মিয়াকে কোলে বসিয়ে লেজে সরষের তেল মালিশ করছে। লেজটা শক্ত আর খাড়া হয়ে গেছে গোঁজের মতো। আমার সাড়া পেয়ে হারাধন করুণ মুখে বলেছিল—কী সর্বনাশ হয়ে গেছে দেখছেন ছোটবাবু?

বলেছিলুম—তা তো দেখছি। লেজে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়। সকালে কোবরেজমশায়ের কাছে নিয়ে যাও।

হারাধন মাথা নেড়েছিল।—এ রোগ সারানো কি সহজ কথা? বিল্লু মিয়ার গোঁফগুলোও কেমন সূঁচের মতো শক্ত হয়ে গেছে দেখছেন না?

হেসে বলেছিলুম তাহলে তোয়াব ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে দিও।

হারাধন বলেছিল—না ছোটবাবু। শহরের হাসপাতাল ছাড়া সুবিধে হবে না।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। তাই ঘরে ঢুকলুম এবং মামার নির্দেশ-মতো দরজা ভাল করে এঁটে শুয়ে পড়লুম।···

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। পূবের জানলাটা খোলা ছিল। মশার উৎপাতে মশারি খাটাতে হয়েছে। মশারির ভেতর থেকে জানলাটা আবছা দেখা যাচ্ছিল। বাইরে জ্যোৎস্নার রাত। হলুদ রঙের ছবির মতো জানলার ফ্রেম থেকে কালো কালো মোটা রেখার মতো রডগুলো ফুটে উঠেছে। কেন ঘুম ভাঙল এবং শব্দটা কিসের, খুঁজছি—এমন সময় জানলার হলুদ পটে ডোরাকাটা কালো দাগওয়ালা চৌকো ছবিটা পুরো কালো হয়ে গেল।

চমকে উঠলুম। টর্চ আছে বালিশের পাশে। খুঁজে নিয়ে সাবধানে মশারির ভেতর থেকে মুখ বের করলুম। তারপর টর্চের সুইচ টিপে দিলুম। এক ঝলক তীব্র আলো গিয়ে পড়ল। মাত্র তিন মিটার দূরে জানলার রডে বাইরে থেকে কী একটা ভুষকালো ভালুকের মতো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলজ্বলে নীল দুটো চোখ। কশের দুদিকে দুটো বাঁকা দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। মুখটা অতি ভয়ঙ্কর।

দেখামাত্র আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—মামা! মামা! ভালুক! ভালুক!

কোথায় ঢাকুর গর্জন শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভালুক কিংবা বিদঘুটে জন্তুটা অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি আরও জোরে চেঁচালুম--মামা! মামা! তারপর মশারি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু জানলার দিকে যেতে সাহস হল না। দরজা যে খুলব, সে-সাহসও হল না। কেবল চেরা গলায় চেঁচাতে থাকলুম—মামা! মামা!

কিন্তু কী আশ্চর্য, পাশের ঘরে হিরণমামার কোনও সাড়াশব্দ নেই।

তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ফার্মে অতগুলো লোক থাকে—তাদেরও কোনও সাড়াশব্দ নেই। খালি ঢাকু বেজায় গর্জন করছে থেকে থেকে।

এবার গলা চড়িয়ে ডাকলুম—হারাধন! মুকুন্দদা! ঘণ্টা! দাতুয়ার সিং! কোনও সাড়া নেই।

আমার বুকের ঢিপঢিপ শব্দটা বেড়ে গেল। শরীর ভারি হয়ে উঠল। তাহলে কি ওই হিংস্র বিদঘুটে ভালুকজাতীয় প্রাণীটা একে একে সবাইকে হত্যা করে ফেলেছে?

কিছু বুঝে উঠতে পারলুম না। এই নির্জন মাঠে তাহলে মাথা ভেঙে মরলেও কেউ সাহায্য করতে আসবে না। গ্রাম বেশ কিছুটা দূরে—নদীর ওপারে।

শিগগির কিছু একটা করা দরকার। দরজা খুলে বেরুলে জন্তুটা নিশ্চয়ই আমাকে আক্রমণ করবে। সম্ভবত আমার ঘরের দরজা বন্ধ দেখেই সে পেছন ঘুরে জানলায় গিয়ে মতলব আঁটছিল। হয়তো ঢাকুও আমার মত কোথাও নিরাপদে ঘরে আটকে আছে বলে তারও ক্ষতি করতে পারেনি। ঢাকুর গরগর গর্জন সমানে শুনতে পাচ্ছি।

এতক্ষণে টের পেলুম, বাইরে সারারাত যে আলোগুলো জ্বলে—জ্বলছে না। তখনই সুইচ টিপে আলো জ্বালার কথা মাথায় এল। সুইচ টিপলুম।

কিন্তু আলো জ্বলল না ঘরে। এবার আতঙ্কটা বেড়ে গেল। লোডশেডিং নাকি? -

ঘরের একোণা ওকোণায় টর্চের আলো ফেলে একটা লোহার রড পেয়ে গেলুম। অমনি সাহস ফিরে এল। মরীয়া হয়ে দরজা খুললুম।

বাইরে লনে, ফুলবাগিচায়, ফসলের ক্ষেতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে আছে ওপাশের মুরগিঘরগুলো। পেছনে পুকুরের জলে জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে। বাতাস বইছে শনশনিয়ে।

কোণার দিকে সেই তালগাছের মাথায় ভূতুড়ে বাজনা বাজছে খর খর সর সর। শিমূল গাছের ন্যাড়া ডালপালা কংকালের মতো নাচ জুড়েছে। সেখান থেকে একটা প্যাঁচা বিশ্রীরকম চেঁচাল, ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও! ক্র্যাঁও!

টানা বারান্দায় জ্যোৎস্না পড়েছে আধাআধি। কেউ শুয়ে আছে সেখানে। টর্চ জ্বেলে দেখি, হারাধন। তার বুকের ওপর শুয়ে আছে বিল্লু মিয়া।

কিন্তু রক্তটক্ত নেই। দৌড়ে গিয়ে তার কাছে ঝুঁকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলুম—হারাধন! হারাধন!

বেড়ালটা ঘুম ভেঙে আড়ামোড়া দিল। হাই তুলল। তারপর লাফ দিয়ে সরে গেল। লেজটা তেমনি খাড়া। কিন্তু হারাধন যে মারা যায় নি, তার প্রমাণ তার শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। ধাক্কাধাক্কি করে ওঠানো যাচ্ছে না দেখে রেগে আমি জোরে তার পাঁজরে চিমটি কাটলুম।

অমনি হারাধন পাশ ফিরে শুল। ঘুমের ঘোরে বলল—ভ্যাট্! খালি ইয়ার্কি!

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী? যে সংঘাতিক বিপদের কথা ভেবে অস্থির হয়েছি, তার চিহ্নটিও যে দেখছি না। হারাধন মাদুর পেতে শুয়ে আছে। শেষরাতের একটু আধটু শীতের কথা ভেবে পাশে একখানা চাদরও রেখেছে। নিশ্চয় গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে পড়ে আছে লোকটা।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চারদিক দেখতে থাকলুম। তাহলে আগাগোড়া সবটাই কি আমার নিছক দুঃস্বপ্ন এবং কল্পনা?

ধীরেসুস্থে উঠে মামার ঘরে টর্চের আলো ফেললুম। হুঁ, দরজা ভেতর থেকে যথারীতি বন্ধ। কিন্তু তাই দেখেই এতক্ষণে রাগ হল। এত গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করলুম, তবু ওঁর ঘুম ভাঙল না? দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলুম—মামা! মামা!

সাড়া এল না। আরো জোরে ধাক্কা দিলুম। আরো জোরে

চেঁচালুম। তারপর চমকে উঠলুম। যেন হিরণমামার সাড়া পেলুম কোথাও বাইরে থেকেই।

ক্ষীণস্বরে বললেন—টিটো! আমি এখানে!

ঘুরে লনের দিকে টর্চের আলো ফেলতেই দেখি, লনের শেষদিকে একটা ঝাঁকড়া বাতাবি লেবুগাছের গোড়ায় হিরণমামা শুয়ে আছেন। পরণে রাতের পোশাক। ঘরের বিছানা ছেড়ে লেবুতলায় ঘাসের ওপর ঘুমোতে যাওয়া ওঁর স্বভাব নয়। নাকি, এই হরিণমারার আবহাওয়ায় এসে উনিও অদ্ভুত হয়ে উঠেছেন?

দৌড়ে কাছে যেতেই হিরণমামা চাপা গলায় বললেন—দরজা! দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে আয়! শিগগির!

অবাক হয়ে বললুম—কেন? ভেতরে কে……

মুখের কথা শেষ না হতেই ওঁর ঘরের দরজা খুলে কে বেরুল এবং বারান্দা দিয়ে দৌড়ে গেটের দিকে চলল। এত অবাক হয়েছি যে আলো ফেলতে দেরী করলুম। লোকটা ঘরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিরণমামা ব্যস্তভাবে বললেন—হাঁ করে কী দেখছিস? আমার বাঁধন খুলে দে। টর্চের আলোয় যা দেখলুম, স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। হিরণমামার দুহাত পিঠের দিকে বাঁধা। পা দুটোও বাঁধা। চিত হয়ে শুয়ে আছেন ঘাসের ওপর।

অনেক কষ্টে হাতের বাঁধন খোলার পর উনি উঠে বসলেন এবং নিজে পায়ের বাঁধনটা খুলে বললেন—একটু জল আন শিগগির! মাথা এখনও ভোঁ ভোঁ করছে। আমার ঘরের ভেতর কুজোয় জল আছে দেখ্ গে।

দৌড়ে জল নিয়ে এলুম। ঘরের ভেতর কেমন একটা গন্ধের ঝাঁজ নাকে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করার মতো গন্ধটা। হিরণমামা মাথায় ও চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে বললেন—মনে হচ্ছে, ব্যাটা আমাকে অজ্ঞান করেছিল। যাক্‌গে, আমাকে ধর। ওঠা যাক্।

আমার সাহায্যে টলতে টলতে উনি ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন—মেইন সুইচটা নিশ্চয় অফ করে রেখেছে। যা, অন করে দিয়ে আয়। তারপর পোলট্রি ঘরের ওখানে গিয়ে দেখ্ তো বাবা, ঢাকুকে কোথায় বেঁধে রেখেছে ব্যাটা।.....

হুঁ, মেইন সুইচ অফ করা ছিল। অন করে দিতে আলো জ্বললো খামারবাড়িতে। মুর্গিঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম, ঢাকুর গলার

মেইন সুইচটা নিশ্চয় অফ করে রেখেছে।

বকলেসের সঙ্গে যে চেনটা জড়ানো থাকে, সেটা একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। খুলে দিলে ঢাকু দৌড়ে গেটের দিকে চলে গেল এবং খুব ঘেউ ঘেউ করে দেশোয়ালী ভাষায় গাল জুড়ে দিল।

এতক্ষণে দাতুয়ার সিংয়ের সাড়া পেলুম গেটের পাশে ওর ঘর থেকে। —চোপ্, চোপ্! খালি চিল্লাতা! বান্দর কাঁহেকা!

তারপর দেখলুম, মুকুন্দ চোখ মুছতে মুছতে আটচালার ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। ওখানে ট্রাক্টার আর হার্ভেস্টার কম্বাইন থাকে—যা দিয়ে ফসল কাটা ও মাড়াই হয়। মুকুন্দ সেখানেই খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকে। তার কাছে ঘণ্টাও ঘুমোয়।

মুকুন্দ ঘুম ঘুম গলায় বলল—কী হল টিটো? রাতদুপুরে এখনও ঘোরাঘুরি করছ কেন?

রাগ হয়েছিল। জবাব দিলুম না। হারাধনও ততক্ষণে উঠে বসে থামে হেলান দিয়ে বিড়ি টানছে। আমি তাকে ধমক দেব ভেবে এগিয়ে যেতেই সে বিড়ি ফেলে শুয়ে পড়ল ঝটপট। বিড়িটা ঘাসে গিয়ে জ্বল জ্বল করতে থাকল। ঘরে ঢুকলে হিরণমামা বললেন—যাক্ গে। কিছু করার ছিল না। ব্যাটা নিশ্চয় জানলা দিয়ে সন্ধ্যা থেকে লক্ষ্য রেখেছিল। খাওয়ার পর তুই গিয়ে শুয়ে পড়লি, আমিও শোব-শোব করছি—দরজা আটকাব ভাবছি, হঠাৎ ঢাকু গজরাতে লাগল। তারপর আলো নিভে গেল। তারপর কেউ ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মনে হচ্ছে, নাকে ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল চেপে ধরেছিল।

—সে কী! কেন?

—তুই কাল ঠিকই বলেছিলি টিটো। সেই ফর্মুলা চুরি করতে এসেছিল। তাছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

—সর্বনাশ! তাহলে সত্যি চুরি করে নিয়ে গেল ওটা?

হিরণমামা একটু হেসে মাথা দোলালেন। —না। ওটা আমি এ ঘরে রাখিনি। ব্যাটা সেই রাত সাড়ে বারোটায় ঢুকে আমাকে অজ্ঞান করেছে, এখন রাত তিনটে বাজে। এই আড়াই ঘণ্টা ঘরটা লণ্ডভণ্ড করে কেমন হাতড়েছে তাকিয়ে দেখলেই টের পাবি।

এবার ঘরের ভেতরটা দেখে প্রায় কান্না পেল। অথচ হিরণমামা হাসছেন। ল্যাবরেটরী ভাঙচুর। জিনিসপত্র ছত্রখান। বললুম—হারাধনকে জাগাবার সময়ও যদি জানতুম, ব্যাটা ঘরে ঢুকে আছে!

হিরণমামা ম্লান হাসলেন। —জেনেও কিছু করতে পারতিস

বলে মনে হয় না। হয়তো তোকে খুন করে বসত ব্যাটা! যা হয়েছে, ভালই হয়েছে রে।

শিউরে উঠলুম। —লোকটা কে মামা? তাকে কি চিনতে পেরেছেন।

—হুঁউ। হিরণমামা চাপা স্বরে বললেন। ওর নাম কালিকিঙ্কর। প্রদীপশঙ্করের মাসতুতো দাদা। একসময় গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে জন্তুজানোয়ারের খেলা দেখাত—যাকে রিঙ মাস্টার বলে লোকে।

এতক্ষণে সেই ভাল্লুকের কথাটা মনে পড়ে গেল। হিরণমামাকে সবটা জানালুম। শুনে উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—হ্যাঁ। ওর একটা পোষা জন্তু আছে বটে। অনেক বছর পরে গ্রামে ফিরে আসার সময় ওটাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওটা ভাল্লুক নয়।

—তবে কী?

—একজাতের গরিলা। আমিও একদিন গিয়ে দেখে এসেছিলুম। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে চাদ নামে একটা রাজ্য আছে। সেখানে ওই বাঁকানো দাঁতওয়ালা গরিলা দেখা যায়। যাক গে, যা হবার হয়েছে। গিয়ে শুয়ে পড়। সকালে এ নিয়ে ভাবা যাবে। কিন্তু একটা কথা, এই ঘটনাটা কাকেও বলিসনে। ওর মনে হচ্ছে, কেউ কিছু টের পায়নি।

এরপর একা ওঘরে শুতে ভয় করছিল। হিরণমামার কাছে ভয়টা প্রকাশ করা যায় না। বাইরে গিয়ে আটচালার ওখানে চাপা গলায় মুকুন্দকে ডাকলুম। মুকুন্দ ফের শুয়ে পড়েছিল। সাড়া দিয়ে বলল—টিটো নাকি? কী হয়েছে বলো তো? এখনও ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছ কেন?

রাগ দেখিয়ে বললুম—মুকুন্দদা! তুমিও কি হারাধনের মতো গাঁজাটাজা খাও?

মুকুন্দ বলল—খেতুম বটে অল্পস্বল্প। আজকাল কোবরেজ-মশাইয়ের মতো ফড়িং খাওয়া ধরেছি। তা বুঝলে টিটো, নেশাটা বেশ জমিয়ে ধরে। খাওয়ার পর প্রথম দু তিন ঘণ্টা তো সাউণ্ড

স্লিপ হয়। খাবে নাকি? অনিদ্রার ভারি ভাল ওষুধ ভাই। দেখো না, ঘণ্টা কেমন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

এই পাগলছাগলদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তবে আমার সন্দেহ বেড়ে গেল। ফার্মের সবাই নিশ্চয় ফড়িং খাওয়া ধরেছে। নৈলে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কেউ টের পেল না! দিব্যি নাক ডাকিয়ে সব ঘুমোচ্ছিল!

কালিকিঙ্করের ভয়ে যতটা নয়, তার বিদঘুটে গরিলাটার আতঙ্কে এবার আমি সব জানলা বন্ধ করে দিলুম। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে রাখলুম।

শুয়ে হঠাৎ মাথায় একটা কথা ভেসে এল। আচ্ছা, কালিকিঙ্করকে ফার্মে ঢুকতে দেখে ঢাকু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি কেন? ধরা যাক, গরিলাটার ভয়ে দৌড়ে পিঠটান দিয়েছিল সে।

কিন্তু তাহলে তাকে চেনে আটকে রাখল কে? নিশ্চয় কালিকিঙ্কর নয়। ঢাকু খামারবাড়ির বাইরের লোককে গলার চেনটা খুঁটিতে বাঁধতে দেবে বিনা আপত্তিতে, সেটা অসম্ভব। গরিলাটার ভয়ে হয়তো কোণঠাসা হয়েছিল সে। কিন্তু তাকে বেঁধে রাখল কে? ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়।.....

॥ তিন ॥

হিরণমামার ওপর রাগ হয়েছিল। এমন কাণ্ড বেমালুম চেপে গেলেন! থানায় খবর দিতে পারতেন, এমন কী কালিকিঙ্কর চৌধুরীকে ধরিয়ে দিতে পারতেন পুলিশের হাতে। সেসব কিছু করলেন না। বেলাবেলি ঘরের ভেতরটা প্রায় আগের মতো সাজিয়ে নিলেন। কিছু জার এবং কাচের যন্ত্রপাতি ভেঙে গিয়েছিল। নিজের হাতে সাফসুতরো করে ফেললেন। সাহারা মরুভূমির ফড়িং-গুলো মেঝেয় পড়ে ছিল। একটা একটা করে কুড়িয়ে এলুমিনিয়মের একটা ট্রেতে রাখলেন।

আমি সকালে উঠেই আমার ঘরের সেই জানলাটা পরীক্ষা করেছিলুম। হুঁ, কালো লোম পড়ে আছে অজস্র। দেঁতো গরিলাটার গায়ের লোম। কালিকিঙ্কর সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ওকে। মতলব কী ছিল? আমাকে ভয় দেখানো? ঠিক আছে। ফের ওকে নিয়ে এসে হানা দিক না। তখন ঠেলাটা টের পাইয়ে দেব। এই টিটোকে তো চেনে না কী জিনিস!

ফার্মের লোকগুলো অন্যদিনের মতো নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত। মুকুন্দ দাড়ি দুভাগ করে দুইকানে জড়িয়ে পাওয়ারটিলার চালাচ্ছে মাঠের কাদাভরা জমিতে। হিরণমামা জাপানী ধানের বীজ ছড়াবেন ওখানে—সেও নাকি ওঁর একটা গবেষণার ব্যাপার। দেখলুম, মুকুন্দ গামবুট পরে ছোট্ট ওই চাষযন্ত্রটা চালাচ্ছে আর পোকামাকড় খাওয়ার জন্যে তিনটে বক, চারটে শালিক, দুটো কাক, একটা ফিঙে তার পেছন-পেছন মিছিল করে এগোচ্ছে। মুকুন্দ যেন মিছিলের নেতা। তারপর কোত্থেকে ঢাকু গিয়ে পুলিশের মতো হামলা করল। পাখির মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

পুকুরের ধারে একটা পাম্প জল তুলছে সশব্দে। সেখানে ঘাসের

জঙ্গলে একবার বিল্লুমিয়ার লেজটা দেখলুম। সেই রকম গোঁজ হয়ে আছে। নিশ্চয় ফড়িং ধরার জন্যে ওৎ পেতেছে বেড়ালটা।

শেষপ্রান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বিশাল মাঠ দিগন্তে মিশেছে। আনমনে তাকিয়ে আছি। সেই সময় ড্রাইভার আরশাদ এসে মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বলল—সায়েব ডাকছেন মার্শাল টিটো।

গেটের কাছে মামার জিপটা দাঁড় করানো। সেখানে হিরণমামা রয়েছেন! দাতুয়ার সিং দারোয়ানকে কী সব উপদেশ দিচ্ছেন হয়তো। আমাকে দেখে বললেন—আয় টিটো! আমরা একবার গ্রামে ঘুরে আসি।

—হরিণমারা যাবেন মামা?

—হুঁ। বলে হিরণমামা রহস্যময় ভঙ্গীতে চোখ নাচালেন। ঠোঁটে মুচকি হাসি।

আমাদের জিপগাড়ি বাঁধের পথে কিছুদূরে চলার পর নদীর ব্রিজের কাছে পাকা রাস্তায় উঠল। তারপর গ্রামের দিকে ছুটল। সেই সময় হিরণমামা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—আমরা কালিকিঙ্করের কাছেই যাচ্ছি।

চমকে উঠলুম। কিন্তু কিছু বললুম না। রাতের সেই বিদঘুটে জন্তুটা গরিলা হোক আর যাই হোক, দিনের বেলা সেটাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু অবাক লাগল, হিরণমামা ওই চোর বদমাস কালিকিঙ্করের কাছে কেন যাচ্ছেন?

একটু পরে জিপ গ্রামে ঢুকল। নামেই গ্রাম। আসলে শহরে-গ্রামে মিলে একটা জগাখিচুড়ি। বাজারের ভিড় পেরিয়ে দুধারে গা ঘেঁষাঘেঁষি ইট আর মাটির বাড়ি দেখলুম। পাকা বাড়িগুলো মনে হল অনেক কালের। কোন-কোনও বাড়ির কার্নিসে গাছ গজিয়ে রয়েছে। মনে হল, এককালে হরিণমারা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এরপর সংকীর্ণ রাস্তা ঘুরে ঘুরে অনেক গলিঘুঁজি ও বাঁকের পর একটা ফটকের সামনে জিপ থামল। চারদিকে উঁচু উঁচু গাছপালার

জঙ্গল। তার মধ্যে পাঁচিলঘেরা বিশাল এলাকা নিয়ে এই বাড়ি। ফটকের দুপাশে দুটো সিংহের মূর্তি। কিন্তু বড় জীর্ণ দশা তাদের। ফটকের ওপাশে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল, তার চেহারাও ক্ষয়াটে এবং রুগ্ন। হিরণমামা না বললেও বুঝলুম, এটাই সে-আমলের জমিদারের বাড়ি।

কোনকালে নুড়িবিছানো সুন্দর পথ ছিল গাড়িবারান্দা অব্দি। এখন ভাঙাচোরা অবস্থা। পা হড়কে যায়। ফুলবাগিচা জঙ্গল হয়ে গেছে। তার মধ্যে কোথাও একটা পাথরের মূর্তি উঁকি মারছে। বাড়ির চারপাশে জঙ্গলে গাছপালায় ঘিরে ধরেছে। এ যেন এক হানাবাড়ি। এর মধ্যে মানুষ বাস করে বলে মনেই হল না।

আরশাদ জিপে বসে আছে। হিরণমামা আর আমি গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছলে একটা প্রৌঢ় লোক এক গাল হেসে বলল—ওরে বাবা! বড়বাবু যে! পেন্নাম হই বড়বাবু!

হিরণমামা বললেন—তোমার বুড়োকর্তা কেমন আছেন ভজহরি?

—ওনার আর থাকা! কদিন থেকে হাঁপের কষ্টটা বেড়েছে।

—চিকিৎসা চলছে তো?

—তা চলছে। গোবিন্দ কবরেজ একটু আগে দেখে গেলেন। এবার তোরাব ডাক্তার আসার সময় হল।

হিরণমামা আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন—বলো কী ভজহরি! কোবরেজী আর এ্যালোপ্যাথি দুটোই চলছে নাকি কর্তাবাবুর?

ভজহরি ঘাড় নেড়ে বলল—কর্তাবাবুর মনটা নরম যে! যেচে পড়ে দুজনেই এসে সাধাসাধি করেন ওষুধ নিয়ে। কাকে ফেরাবেন বলুন আজ্ঞে? কোবরেজমশায়কে যদি বলেন, তোমার ওষুধ খাবোনা—কান্নাকাটি জুড়ে দেবেন। ওদিকে তোরাব ডাক্তার·····

তার কথায় বাধা পড়ল। কোথাও একটা জন্তু আঁর্‌র্‌র্‌র্‌··· আঁর্‌র্‌র্‌র্‌ করে বিকট গর্জন করে উঠল হঠাৎ। আমি বললুম—ও কী!

ভজহরির মুখটা গম্ভীর দেখাল। চাপা গলায় বলল—আর

বলবেন না। কালী কর্তা আসার পর থেকে ওই চলেছে। বিদঘুটে একটা বনমানুষ এনেছেন কোত্থেকে। রোজ সকালে তাকে কী সব খেলা শেখাবেন। শিখতে চাইবেনা। তখন ইলেকটিরি চাবুক মারবেন। কান ঝালাপালা হয়ে গেল বড়বাবু! কবে না বনমানুষটা ক্ষেপে গিয়ে ওনাকে মেরে ফেলে!

হিরণমামা বললেন—তুমি তোমার কালীকর্তাকে খবর দাও ভজহরি। আমরা ওঁর কাছেই এসেছি।

আমাদের হলঘরে বসিয়ে রেখে ভজহরি চলে গেল। জন্তুটার গর্জন বা অর্তনাদ সমানে ভেসে আসছে। ওকে কী খেলা শেখাচ্ছেন কালিকিঙ্কর?

হিরণমামার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, উনি কী যেন ভাবছেন। ভাবনাটা গভীর কিছু—কারণ উনি একটা করে দাড়ি ওপড়ানোর চেষ্টা করছেন অভ্যাসমতো। মামার এই ব্যাপারটা দেখলে হাসি চাপা যায় না! কিন্তু হাসবার কথা ভুলে গেছি। গরিলাটা সমানে আঁর্‌র্‌র্‌র্‌···আঁর্‌র্‌র্‌র্‌ করে চলেছে। নির্জন স্তব্ধ বাড়িতে ওই শব্দটা কী ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে!

একটু পরে ভজহরি ফিরে এসে বলল—উনি আপনাদের যেতে বললেন বড়বাবু।

—ঠিক আছে, চলো। তাই যাচ্ছি। বলে হিরণমামা উঠলেন।

হলঘরের একটা দরজা দিয়ে আমরা আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। তারপর ফের একটা ঘর। এমনি করে কতগুলো ঘর যে পেরোলুম, গুণিনি। সব ঘরের জানলা বন্ধ। ভেতরে অন্ধকার। ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরগুলোয় জিনিসপত্র আছে বলে মনে হচ্ছিল না। করিডোর, আর ছোট-ছোট উঠোনের মতো খোলামেলা জায়গা, তারপর নাটমন্দির পেরিয়ে ভজহরি আমাদের একটা দরজার সামনে দাঁড় করাল। এখানে পৌঁছে গরিলার গর্জন প্রচণ্ড হয়ে কানে ধাক্কা দিল। দরজায় নতুন পর্দা ঝুলছে। ভজহরি চাপাগলায় বলল—এটাই কালীকর্তার ঘর। আসুন!

ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। ঘরটা মস্তো বড়ো। মেঝেয় পুরনো কার্পেট পাতা রয়েছে। শেষদিকটায় গোল একটা খাঁচার মতো লোহার গরাদ ঘেরা জায়গা। অবিকল সার্কাসে বাঘসিংহের খেলা দেখানোর রিঙের মতো। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা শর্টস পরা লোক। গায়ে কালো সাদা ডোরাকাটা গেঞ্জি। তার হাতে চাবুক। গরাদে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিদঘুটে জন্তুটা—বনমানুষ কিংবা সাহারা মরুভূমির গরিলা! দুটো বাঁকানো দাঁত দুই কশায় বেরিয়ে আছে। পিঙ্গল হিংস্র চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল নীল। আমাদের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

কালিকিঙ্কর বেরিয়ে এসে গরাদের দরজায় তালা আঁটলেন। তারপর করজোড়ে নমস্কার করে বললেন—কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন হিরণবাবু!

বাংলায় কথা না বললে মনে হবে একেবারে সায়েব। ফর্সা—একটু লালচে গায়ের রঙ কালিকিঙ্করের। গলায় সোনার চেন। বাহু থেকে কব্জিঅব্দি উল্কি আঁকা। খোলা জানলার ধারে সোফায় বসালেন আমাদের। ভজহরিকে কফি বানাতে হুকুম দিলেন। আমার চোখ গরাদের ভেতর গরিলাটার দিকে। সেও একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে বললুম—হতচ্ছাড়া। রাতে তুমি আমাকে যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছ। বাগে পেলে দেখিয়ে ছাড়ব টিটো কেমন জিনিস।

হিরণমামা বললেন—কালাবাবু, বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসতে হল।

অমায়িক হাসি কালিকিঙ্করের ঠোঁটে। বললেন—বেশ তো! বলুন আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে।...বলে ফের আমার দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন—এ ছেলেটি কে হিরণবাবু?

হিরণমামা শুধু বললেন—আমার ভাগ্নে। কলকাতায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।

কালিকিঙ্কর আমার কাঁধে হাত রেখে আদর করলে আমার গা

ঘিনঘিন করে উঠল। ভেতরে রাগ চেপে রেখে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করলুম।

কালিকিঙ্কর বললেন—হ্যাঁ, বলুন হিরণবাবু।

হিরণমামা বললেন—কাল রাতে আমার ফার্মে চোর ঢুকেছিল।

কালিকিঙ্কর চমকে ওঠার ভঙ্গী করলেন—বলেন কী! কিছু চুরি করেছে নাকি?

হিরণমামা হাসলেন।—না কালীবাবু! চোরের বরাত মন্দ। যা চুরি করতে গিয়েছিল, তা আমি এমন জায়গায় চালান করে দিয়েছি, কারুর সাধ্য নেই তার খোঁজ পায়।

—কিন্তু জিনিসটা কী? খুব মূল্যবান কিছু কি?

—হুঁ। একটা ফর্মুলা।

—ফর্মুলা! কিসের ফর্মুলা?

হিরণমামা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। কালীবাবু নির্বোধ নন বলেই জানি। ফর্মুলাটা কিসের, তা জিগ্যেস না করে বরং আসুন, আমরা এবিষয়ে একটা রফা করে ফেলি।

কালিকিঙ্কর নড়ে উঠলেন। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর চাপা গলায় বললেন—আপনার কথার মানে বুঝলুম না হিরণবাবু।

হিরণমামা বললেন—আমি স্পষ্টভাষী কালীবাবু। কাল রাতে আমাকে আপনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে আমার হাত পা বেঁধে···

কালিকিঙ্কর বাধা দিয়ে ওঁর গরিলাটার মতো গর্জন করে বললেন—কী বলছেন মশাই।

হিরণমামা শান্তভাবে বললেন—আহা! উত্তেজিত হবেন না। আমি যা বলছি, শুনুন!

কালিকিঙ্কর উঠে পড়লেন। আমাদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকলেন। হাতে ইলেট্রিক চাবুক। আমার একটু ভয় করল এতক্ষণে।

কালিকিঙ্কর বললেন—আপনি কি বলতে চান?

ললুম তো! হিরণমামা তেমনি শান্ত ভাবে বললেন। আসুন, আপোসে রফা করি। ফর্মুলাটা কোনও চোরা চালানী দলকে বেচলে বহু টাকা পাওয়া যাবে, জানি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তেমন কোনও দলের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। এখন কথা হচ্ছে,

হিরণমামা বললেন—আমি স্পষ্টভাষী কালীবাবু। [পৃঃ ৩৭

আপনার সঙ্গে যখন পরিচয় আছে—তখন আমি সেটা একটা চমৎকার সুযোগ বলেই মনে করছি। আপনি আমার হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। যা দাম হবে, তার সিকিভাগ আপনাকে দেব। ব্যস।

কালিকিঙ্কর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন হিরণমামার দিকে। ঠোঁট কামড়ে ধরে যেন কী মতলব ভাঁজছিলেন। মামার কথা শেষ হলে বললেন—আপনাকে যতটা সরল লোক ভেবেছিলুম, আপনি ততটা সরল নন হিরণবাবু। যাই হোক, আপনি আমাকে আপনার কী একটা ছাইপাঁশ ফর্মুলা নিয়ে চোর সাব্যস্ত করেছেন—এটা খুবই অপমানজনক। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ জুম্বাকে খাঁচা থেকে বের করে লেলিয়ে দিতুম!

হিরণমামা মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন—তাহলে এ প্রস্তাবে আপনি রাজী নন?

এবার কালিকিঙ্কর চাবুকটা মেঝেয় মেরে বসলেন। চড়াৎ করে একটা শব্দ হল। তারপর চেঁচিয়ে বললেন—গেট আউট। বেরিয়ে যান বলছি! বেরিয়ে যান এক্ষুনি।

হিরণমামা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে কালীবাবু। আমি যে ডেজার্ট লোকাস্ট নিয়ে গবেষণা করে একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করেছি, সে খবর আপনাকে দিল কে?

কালিকিঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জন করে গরিলার খাঁচার দিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর ঝটপট তালা খুলে ফেললেন। দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন—জুম্বা! জুম্বা! বেরিয়ে আয়!

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। হিরণমামা নির্বিকার হয়ে বসে আছেন। গরিলাটা বেরিয়ে এল। মানুষের মতো দুপায়ে হেঁটে সে দুলতে দুলতে আমাদের দিকে এগোতে থাকল।

কালিকিঙ্কর চাবুক তুলে আমাদের দেখিয়ে তীক্ষ্ণ শিস দিলেন পরপর তিনবার। অমনি গরিলাটা আঁর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ আঁর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ করে গর্জন করে উঠল। দুহাত দুপাশে তুলে পা বাড়াল। হাতের আঙুলে বড়বড় ধারাল নখ। মুখের দুপাশে বাঁকা দাঁতদুটো বেরিয়ে পড়ল আরও খানিকটা। হাঁ করে সে তেড়ে এল।

আমি আর সাহস করে হিরণামার মতো বসে থাকতে পারলুম না। সব বীরত্বের বড়াই উবে গেল। ডিগবাজি খেয়ে সোফার পিছনে গিয়ে পড়লুম। তারপর একপলক দেখলুম, হিরণমামা রিভলবার বের করে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপ দিলেন কালিকিঙ্কর। রিভলবার কাড়াকাড়ি চলতে থাকল সোফার পাশে মেঝের ওপর।

গরিলাটা এই আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে যেন। থমকে দাঁড়িয়ে দুলছে। দুজনের লড়াই উপভোগ করছে বুঝি।

হিরণমামা চেঁচিয়ে উঠলেন—টিটো! এই নে!

এক লাফে এগিয়ে ওঁর হাত থেকে রিভলভারটা নিলুম। কালিকিঙ্করের সঙ্গে হিরণমামার ধস্তাধস্তি জাপটাজাপটি চলতে থাকল। মেঝের কার্পেট ওলটপালট হয়ে গেল। দুজনে তার তলায় চাপা পড়লেন।

জুম্বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো আছে।

পিছন থেকে ভজহরির গলা শুনলুম এতক্ষণে।—কী হল, হলটা কী? বাবু মশাইরা মরামারি করছেন কেন?

তারপরই জুম্বাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল—ওরে বাবা রে! তার হাতের ট্রে উল্টে পড়ে গেল। ঝনঝন করে কাপ, চায়ের পট ভাঙ্গার শব্দ হল।

আর ভজহরির পাত্তা নেই। পালিয়ে গেছে। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিনে। সামনে জুম্বা না থাকলে কালিকিঙ্করের মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে জব্দ করে ফেলতুম। রিভলবারটা আমার হাতে কাঁপছে। একবার ভাবছি, জানোয়ারটার বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিই। আবার ভাবছি, গুলি খেয়ে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার সুযোগ হয়তো দেবে না।

সেই সময় আচমকা পাশের ঘর থেকে গোবিন্দ কোবরেজ বেরিয়ে এলেন। আমি তো হতভম্ব। কালিকিঙ্করের ঘরে ওঁর আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কী থাকতে পারে?

কোবরেজ মশাইয়ের হাতে একটা বড় ছুরি। ওই ছুরি দিয়েই উনি লতাপাতা শেকড়বাকড় কাটেন সম্ভবত। কারণ, ওঁর ব্যাগে কাল ওই ছুরিটা দেখেছি।

ছুরি নাচিয়ে উনি আমার দিকে তেড়ে এলেন।—তবে রে খেঁকশিয়ালের বাচ্চা! কালীকর্তাকে খুন করতে এসেছ মামা-ভাগ্নে মিলে?

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—সাবধান কোবরেজ মশাই! একপা এগোবেন না। হাতে কী আছে দেখতে পাচ্ছেন?

রিভলবারটা দেখেই গোবিন্দ কোবরেজ দুপা পিছিয়ে গেলেন।

তারপর ওল্টানো কার্পেটে পা জড়িয়ে গেল। সামলাতে গিয়ে উনি একেবারে জুম্বার ওপর পড়লেন।

অমনি জুম্বা গর্জন করে উঠল আঁর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌·····আঁর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌!

তারপর যা দেখলুম, গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। জুম্বা গর্জে ওঠার পর কোবরেজ মশায়ের মাথায় নখওয়ালা থাবাদুটো প্রচণ্ড জোরে মেরে বসল। কোবরেজ আর্তনাদ করে উঠলেন। জুম্বা তাঁর গলায় কামড় বসাল।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি রিভলবারের ট্রিগারে চাপ দিলুম। আশ্চর্য! গুলি বেরুল না। আবার চাপ দিলুম। গুলি বেরুল না।

ঘটনাটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল। মেঝের জাপটাজাপটি বন্ধ করে হিরণমামা আর কালিকিঙ্কর তাকিয়ে আছেন গরিলাটার দিকে। কোবরেজ মশাইয়ের নিস্পন্দ দেহটা তার পায়ের কাছে। তার বাঁকা দাঁতদুটো রক্তাক্ত। জ্বলজ্বলে হিংস্র দৃষ্টিতে সে কোবরেজ মশাইয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসে গরগর শব্দ।

কালিকিঙ্করকে উঠে আসতে দেখলুম। দৌড়ে সে জুম্বার কাঁধ খামচে ধরে ভাঙ্গাগলায় বললেন—জুম্বা! জুম্বা! এ তুই কী করলি?

আর সেই সুযোগে হিরণমামাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—টিটো! চলে আয়!

যে দরজা দিয়ে এঘরে ঢুকেছিলুম, তার উল্টোদিকের দরজা দিয়ে দুজনে বেরোলুম। পিছনে কালিকিঙ্করের গর্জন শোনা গেল—জুম্বা। জুম্বা। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে!

তারপর তখনকার মতো তিনবার তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হল। জুম্বা ভয়ঙ্কর গর্জন করল—আঁর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌···আঁর্‌র্‌র্‌র্‌···আঁর্‌র্‌র্‌র্‌!

আমাদের বরাত ভাল বলতে হবে। পাশের ঘরে ঢুকেই বুঝেছিলুম, বাড়ির শেষ দিকটায় এসে পড়েছি। এদিকটায় বারান্দার নীচে ঘন আগাছার জঙ্গল। তার মধ্যে উঁচু-উঁচু গাছও আছে অনেক-

গুলো। এটা একসময় নিশ্চয় বাগান ছিল। এখন যেন আমাজনের অরণ্য।

আমরা জঙ্গল ভেঙে এগোচ্ছি। পেছনে হিংস্র জন্তুটা তাড়া করে আসছে। বারবার অমানুষিক গর্জন শুনছি। কখনও কালিকিঙ্করের শিসের শব্দও শুনছি। একখানে দেখি, উঁচু পাঁচিল সামনে মাথা তুলেছে। হিরণমামা ফিস ফিস করে বললেন—এই পাঁচিলের ধার ঘেঁষে চললে গেটের ওদিকে পৌঁছে যাব। সাবধান, গুড়ি মেরে আয়।

এবার মাঝেমাঝে ফাঁকা জায়গা। স্তম্ভে পাথরের প্রতিমূর্তি। শুকিয়ে যাওয়া ফোয়ারা। ছোট্ট নকল হ্রদ—ডোবা বলাই উচিত। তার চারদিকে ফুট পনের উঁচু নকল পাহাড়, পাথর দিয়ে তৈরী। একসময় নিশ্চয় ভারি সুন্দর দৃশ্য ছিল। এখন খাঁ খাঁ শ্মশান যেন।

এই জায়গাটা পেরিয়ে গিয়ে আমরা বাড়ির সামনেটায় পৌঁছলুম। তারপর এক দৌড়ে গেট পেরিয়ে দেখি, আরশাদ জিপ থেকে নেমে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল—কালীবাবুর জানোয়ারটা কি তাড়া করে আসছে নাকি? ওরে বাবা। ওই সত্যিসত্যি আসছে যে।

ঘুরে দেখি, নকল ক্ষুদেপাহাড়ের ওপর চড়ে জুম্বা গরিলাদের স্বভাবমতো দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে আর গর্জন করছে।

আমরা জিপে উঠে পড়লুম। হিরণমামা বললেন—আরশাদ। হাঁ করে কী দেখছ! উঠে এসে স্টার্ট দাও।

আরশাদ যেন ভয়ে মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। একলাফে জিপে উঠল। স্টার্ট দিল। জিপ এগোল। দেখলুম, জুম্বার গর্জন আশেপাশের বাড়ির লোকেরাও শুনতে পেয়েছে। গেটের দিকে কেউ কেউ অতিসাহসীর মতো দৌড়ে যাচ্ছে এবং ওকে দেখেই পালিয়ে আসছে। হরিণমারা জুড়ে এবার একটা হুলুস্থুল শুরু হবে সন্দেহ নেই।...

ক্যাম্পে পৌঁছে হাঁফ সামলে সুস্থ হতে বেশ সময় লাগল। হিরণ-

মামা যত, আমিও তত জল খেলুম। তারপর বললুম—আপনার রিভলবারে গুলি পোরা নেই, মামা।

হিরণমামা একটু হেসে বললেন—হুঁ। ভুলে গিয়েছিলুম গুলি পুরে নিতে!

রাগ দেখিয়ে বললুম—আশ্চর্য ভুল তো! আমার প্রাণ যেতে বসেছিল না?

হিরণমামা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—বালাই ষাট! যাক্ গে, এমন ভুল আর হবে না! নাক কান মলছি। কিন্তু টিটো, কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখলি? গোবিন্দ কোবরেজই যে ফর্মুলার কথা আড়ি পেতে শুনে গিয়ে কালিকিঙ্করের কানে তুলেছিলেন, ভাবতেও পারিনি।

এবার আমি গতরাতে ঢাকুকে বেঁধে রাখার রহস্যটা তুলতে যাচ্ছিলুম, মুকুন্দ এসে গেল। তাই চেপে গেলুম। মুকুন্দ দুই কান থেকে দড়ির দুটো অংশ খুলে এখন দুটো গিঁট পাকিয়ে রেখেছে গলার কাছে। সে বলল—জমিটা চষা হয়ে গেছে বড়বাবু।

॥ চার ॥

সে রাতে ঢাকুকে ফার্মেরই কোনও লোক বেঁধে রেখেছিল, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। হিরণমামা আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু সে কে হতে পারে, আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। হারাধন, মুকুন্দ, আরশাদ, ঘণ্টা আর দাতুয়ার সিং ফার্মে মাইনের কর্মচারী। আর যারা নানান কাজে আসে, তারা মজুরী নিয়ে চলে যায় যে-যার বাড়ি। তারা কেউ হরিণমারার লোক, কেউ আশেপাশের গাঁয়ের। যন্ত্রে ফসল মাড়াইয়ের পর ঝাড়াই করার কাজে আদিবাসী মেয়েরাও আসে। কিন্তু এরা সবাই বাইরের লোক। ঢাকুর সঙ্গে তাদের কারুর ভাব নেই। আদিবাসী মেয়েরা গান গেয়ে-গেয়ে ফসল ঝাড়াই করে। তখন ঢাকু ভারি খাপ্পা হয়ে যায়।

কাজেই সন্দেহের খাতায় ওই পাঁচটা নাম লিখতে হয়। ঘণ্টা তো আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাকে এখন বাচ্চা বলা যায়। সে অমন সাংঘাতিক চক্রান্তে জড়াতেই পারে না। হিরণ-মামা বললেন—বাকি চারজনের দিকে নজর রাখা দরকার। আমি ইতিমধ্যে খোঁজ নিচ্ছি, কালিকিঙ্করের সঙ্গে এদের কারুর যোগাযোগ আছে নাকি।

বিকেলে তোরাব ডাক্তার এলেন। গেটের কাছে ঘোড়া থেকে নামতেই ঢাকু গরগর করে দৌড়ে গেল। আমি আঁতকে উঠেছিলুম। কুকুরটার মেজাজ আজ সকাল থেকে চড়ে আছে। রাতে অমন হেনস্থা হয়েছে কি না!

কিন্তু ঢাকু তোরাব ডাক্তারের কাছে গিয়ে সামনের দুহাঁটু মুড়ে বিরাট হাঁ করছে দেখে আমি অবাক। ডাক্তার সাহেব অমনি পকেট থেকে দুটো বড়ি বের করে তার গলায় ফেলে দিলেন। ঢাকু মুখ বুজিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল। তোরাব ডাক্তার মুচকি

হেসে বললেন—ভিটামিন বড়ি খেতে দিলুম। ভাগ্নেবাবাজী! তুমিও রোজ দুটো করে খেও। তোমার যা হাড়গিলে চেহারা দেখছি!

হিরণমামা যথারীতি অভ্যর্থনা করে বললেন—আসুন, আসুন ডাক্তার সায়েব।

ডাক্তার সাহেব অমনি পকেট থেকে দুটো বড়ি বের করে তার গলায় ফেলে দিলেন। [পৃঃ ৪৪

বারান্দার সামনে সবুজ ঘাসের লনে চেয়ার টেবিল পাতা হল। আমরা বসলুম। তোরাব ডাক্তার বললেন—বড়বাবু খবর শুনেছেন?

—কিসের খবর বলুন তো?

—সে কী! শোনেন নি? অতবড় সাংঘাতিক কাণ্ড! গোবু কোবরেজ বেঘোরে মারা পড়েছে জানেন না?

হিরণমামা আমাকে আড়ালে চোখ টিপে অবাক হবার ভান করে বললেন—এঁ্যা! সে কী?

তোরাব ডাক্তার বাঁকা হেঁসে বললেন—গোবুর বুদ্ধি! গিয়েছিল কালীকর্তার পোষা গরিলাকে ছাগলাদ্য ঘৃত কিংবা শকুনাদ্য পাচন খাওয়াতে। আর ব্যস! মুণ্ডুটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে!

—সর্বনাশ! সর্বনাশ!

—বলছেন সর্বনাশ, আমি বলি নির্বুদ্ধিতার শাস্তি। তোরাব ডাক্তার মুখ আরও বাঁকা করে বললেন।···মশাই! গোবু আর আমি একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশুনো করেছি। তারপর আমি ডাক্তারী পড়তে গেলুম কলকাতা। ওর পড়াশুনা আর হোল না। পৈতৃক পেশা কোবরেজী নিয়ে বসল। এদিকে আমি ডাক্তারী পাশ করে কত জায়গায় হাসপাতালে-হাসপাতালে ঘুরে রিটায়ার করলুম। বুড়োবয়সে গাঁয়ে ফিরে দেখি, গোবু তখনও কোবরেজী করছে। তারপর আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল যে গোবু, সে দিনে দিনে হয়ে গেল আমার শত্রু! ভাবতে পারেন?

—এ্যালোপ্যাথির সঙ্গে কবিরাজীর লড়াই আর কী! বলে হিরণমামা হেসে উঠলেন।

তোরাব ডাক্তার দুঃখিত মুখে বললেন—আপনি হাসছেন বড়বাবু, আমার দুঃখ হচ্ছে। আফটার অল, ছেলেবেলার বন্ধু ছিল গোবু! নিজের বুদ্ধির দোষে গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণ হারাল!

ঘণ্টা ট্রেতে চা বিস্কুট আনল। চা খেতে খেতে ডাক্তার সাহেব আরও কিছুক্ষণ গোবিন্দ কোবরেজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন—গাঁয়ের লোকে খুব রেগে গেছে কালীকর্তার ওপর। শুনলুম, থানার দারোগাবাবুও গিয়ে নাকি শাসিয়ে এসেছেন। কিন্তু সব ওই মুখে-মুখে। কার সাধ্য কালীকর্তাকে শায়েস্তা করে? প্রচুর টাকা নিয়ে এতকাল বাদে দেশে ফিরেছেন। রীতিমতো কোটিপতি বলতে পারেন!

হিরণমামা বললেন—বলেন কী! কোটিপতি?

—তাইতো বলছে লোকে।···তোরাব ডাক্তার ঢকঢক করে অনেকটা চা গিলে ফের চাপা গলায় বললেন—আমি কিন্তু প্রতিশোধ

নেব। আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল গোবু। আমার মশাই খুব রাগ হয়েছে। ওই জানোয়ারটাকে আমি শ্লো-পয়জেন করে মারব। কাকেও বলবেন না যেন।

হিরণমামা আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করে বললেন—সর্বনাশ! না, না ডাক্তারসাহেব। ও একটা সাংঘাতিক জন্তু। ওর ধারে কাছে যাবেন না! সাবধান!

তোরাব ডাক্তার তেমনি বাঁকা হেসে বললেন—আপনি ভাবছেন আমিও গোবুচন্দর? চুপিচুপি রাত্তিবেলা জমিদারবাড়ি ঢুকব। গরু মোষের রোগে যে ইঞ্জেকশানের সূঁচ ব্যবহার করি দেখেছেন সেটা? একফুট লম্বা সূঁচ। সিরিঞ্জও ফুট খানেক। তাহলেই বুঝেছেন, খাঁচার বাইরে থেকে নিরাপদে দাঁড়িয়ে আচমকা পটাৎ করে ইঞ্জেকশান চালিয়ে দেব। ব্যস! কেল্লা ফতে।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সাহেব।—এই রে! ভুলে গেছি যে! ভাগ্নেবাবাজীর জন্যে নিজের হাতে একটা মিক্সচার তৈরী করেছিলুম। আনতে ভুলে গেছি। আঃ হা! যে জন্যে এলুম, তাই সঙ্গে আনলুম না!

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম—আগের মিক্সচার খেয়ে আমার গায়ে খুব জোর হয়েছে ডাক্তার সায়েব। আমি সেরে গেছি।

—তাহলে তো এবার দ্বিতীয় মিক্সচার খেতেই হবে।···বলে তোরাব ডাক্তার লম্বা ঠ্যাং ফেলে প্রায় দৌড়ুলেন গেটের দিকে। তারপর ওঁর বাঁকাঠেঙো ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ খটাখট্‌ শব্দ ভেসে এল।

আমি করুণ মুখে বললুম—ও মামা! সত্যি যে উনি মিক্সচার আনতে গেলেন!

হিরণমামা হেসে বললেন—পথে যেতে যেতে ফের ভুলে যাবেন। ভাবিস নে। আমার ভাবনা হচ্ছে, উনি যদি সত্যিসত্যি জুম্বাকে ইঞ্জেকশান দিতে চান, বিপদে পড়বেন! তার আগে একটা কিছু···

ওঁকে থামতে দেখে বললুম—কী মামা?

হিরণমামার মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেছে। চাপা গলায় বললেন—টিটো, আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, কালিকিঙ্কর হরিণমারায় থাকতে আমাকে নিশ্চিন্তে ফার্ম চালাতে দেবে না—গবেষণাতেও বাদ সাধবে। যদ্দিন না ওই ফর্মুলাটা হাতাতে পারবে, তদ্দিন জ্বালাতন করবে ব্যাটা। তবে ওকে আমি একটুও ভয় করিনে—ভয় শুধু ওর পোষা জন্তুটাকে। জুম্বা ওর সঙ্গে থাকলে কেউ বোধ করি ওকে শায়েস্তা করতে পারবে না। তাই ভাবছি, জুম্বাকে আমি খতম করব। তারপর ওর মুখোমুখি হয়ে ওকে টিট করব।

অস্বস্তি হল হিরণমামার কথা শুনে। বললুম—থাক্ মামা। ওকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।

হিরণমামা কঠোর মুখে বললেন—না রে টিটো। জুম্বা বেঁচে থাকলে আরও অনেক মানুষের প্রাণ যাবে। ভাগ্যিস, কাল রাতে জন্তুটাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢোকেনি কালিকিঙ্কর! জুম্বাকে ভেতরে নিয়ে এলে নির্ঘাৎ দু'একটা প্রাণ যেত। হারাধন ওখানটায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। মেসিন ঘরে খোলামেলায় মুকুন্দ আর ঘণ্টা শুয়েছিল। ওদিকে দাতুয়ার সিংও বাইরে খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছিল। তারপর ছাখ্, তুইও দরজা খুলে বেরিয়েছিলি। জুম্বার সামনে পড়লে কী হত বলা যায় না। আমি আগে ওটাকে শেষ করব। তারপর কালিকিঙ্ককে দেখে নেব।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—তখন কী চান্সটাই না গেল মামা। যদি আপনার রিভলবারে গুলি পোরা থাকত, ওই সুযোগে জুম্বাকে শেষ করে দিতুম!

হিরণমামা বললেন—যাক্ গে। যা ভুল হয়েছে, হয়েছে। টিটো, আজ রাতেই আমি কালিকিঙ্করের ঘরে হানা দেব।

—আমি সঙ্গে যাব, মামা।

—না রে। আমি একা যাব। সঙ্গে তুই থাকলে অসুবিধে হবে। তুই বরং ফার্মে জেগে বসে থাকবি। কড়া নজর রাখবি।

যদি দেখিস, রাত পুইয়ে গেল—আমি ফিরলুম না, তাহলে তুই সোজা থানায় যাবি। বলবি যে আমি জমিদার বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেছি সন্ধ্যায়, ফিরিনি। তোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে টিটো। গোপন করার যতটুকু, গোপন করবি। কেমন?

সায় দিয়ে মাথা দোলাতে হল। কিন্তু মনে মনে প্ল্যানটা মোটেও পছন্দ হল না। অথচ হিরণমামার জেদী স্বভাবের কথা তো জানি! যা ভেবেছেন, তা না করে ছাড়বেন না।

একটু পরে উনি ফের বললেন—শোন্। ফর্মুলাটা কোথায় রেখেছি, তোকে দেখিয়ে দিয়ে যাব। আমার কোনও বিপদ আপদ হলে তুই ওটা নিয়ে কলকাতায় একজনের কাছে যাবি। তাঁর নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যাব তোকে। হারাসনে যেন। সাবধান।...

ঘরে ওঁর খাটের মাথার দিকে একটা র‍্যাক। অজস্র বই ঠাসা আছে। একটা লম্বা-চওড়া বই টেনে নিলেন হিরণমামা। বইটার নাম 'দি প্রি-হিস্টোরিক ম্যান এ্যাণ্ড হিজ ফুড।' সোজা বাংলায় আদ্যিকালের মানুষ আর তার খাদ্য।

হিরণমামা চাপা গলায় বললেন—সত্যি বলতে কী, এই বইটাই আমার ফরমুলা।

আমি অবাক হয়ে বললুম—বইটাই ফরমুলা? তার মানে—এই বইটা যে পড়বে, সেই জেনে ফেলবে কেমন করে পঙ্গপাল ফড়িঙের পেট থেকে মারাত্মক নেশার জিনিস তৈরী করা যায়?

হিরণমামা মাথা দুলিয়ে বললেন—ঠিক বলেছিস।

—কিন্তু এটা তো পুরনো বই। আপনার লেখাও নয়।

—সেটাই মজা রে টিটো!

আমি আরও অবাক হয়ে বললুম—কী বলছেন মামা! তাহলে আর নিজে ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন বলছেন কেন?

হিরণমামা রহস্যময় হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন—হু। আবিষ্কার আমারই। কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় নেশার জিনিস তৈরী করা যাবে, তা আমাকে কষ্ট করে লিখতে হয়নি। এই বইতেই সব আছে।

হিরণমামার হেঁয়ালী বোঝবার সাধ্য আমার নেই। তাই হতাশ-ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলুম। উনি বইটার পাতা উল্টে বললেন—নাঃ। তোকে খুলে বলা দরকার। সচরাচর কোনও গুরুত্বপূর্ণ গোপন আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা সাংকেতিক ভাষায় লিখে রাখেন। যেমন ধর, কেউ একটা মারাত্মক আলোকরশ্মি আবিষ্কার করলেন, যা টর্চের মতো বোতাম টিপে কারুর গায়ে ফেললে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এক সেকেণ্ডে। তিনি সেই আলো সৃষ্টির প্রক্রিয়া এ বি সি ডি এইসব হরফ আর এক দুই তিন চার এইসব সংখ্যার সাহায্যে লিখে ফেললেন। আর কেউ তার রহস্য বুঝবে না। ওটাকেই বলা যাক্, গোপন ফরমুলা। আমার ফরমুলাটা অত বিদঘুটে নয়। অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা আমি ব্যবহার করিনি। আমি কী করেছি, ছাখ্। এই পাতায় কোন কোনও শব্দের তলায় ফুটকি দেখতে পাচ্ছিস তো?

দেখে নিয়ে বললুম—হুঁউ।

—ফুটকিওলা শব্দ এই বইয়ে অজস্র দেখতে পাবি। এবার সবগুলো শব্দ কাগজে লিখে ফেললেই হল। পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। যেমন এই পাতায় কোন্ কোন্ শব্দের তলায় ফুটকি দিয়েছি ছাখ্।

বাইরে পায়ের শব্দ হল। হিরণমামা বইটা বুজিয়ে ফেললেন তক্ষুনি। তারপর চড়া গলায় বললেন—পড়াশুনা না করলে কি চলে বাবা? স্কুল কলেজে কতটুকু পড়াশুনা হয় শুনি? চুপচাপ সময় না কাটিয়ে এই বইগুলো পড়বি। কত কী জানতে পারবি।

মুকুন্দ দরজা থেকে বলল—বড়বাবু, মনে হচ্ছে ঝড়টড় আসতে পারে। আকাশ ওদিকে কালো হয়ে গেছে। গুদোমঘরের চাবিটা দিন। ছোলার বস্তাগুলো বাইরে পড়ে আছে।

হিরণমামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাবির গোছা দিয়ে বললেন—চলো, আমিও যাচ্ছি।

মুকুন্দ চলে গেলে আমি বললুম—কিন্তু বইটা এভাবে রাখা হয়তো ঠিক হয়নি মামা।

হিরণমামা বললেন—এভাবে রেখেছি বলেই তো কারুর সন্দেহ

হবে না। রাতে কালিকিঙ্কর এই বইগুলোও হাতড়েছিল। পায় নি। ও ভেবেছিল, কোনও কাগজে আলাদা করে লেখা আছে বুঝি। যাক গে, র‍্যাকটা গুছিয়ে রাখ্ আগের মতো। আমি আসছি।...

ঝড় সত্যি এল। তবে অনেক দেরী করে এল প্রচণ্ড ঝড়। তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের ঝিলিক। আবার কানে তালা-ধরানো গর্জন মেঘের। কোথাও নিশ্চয় বাজ পড়ল। ঝড়ের তাণ্ডব বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। চারপাশে ফাঁকা মাঠ। মনে হচ্ছিল, খামারবাড়িটা উপড়ে নিয়ে যাবে। দরজা জানলা বন্ধ করে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ ঝড়ের পর শিল পড়া শুরু হল। বাইরে ঘন অন্ধকারে শিল পড়ার শব্দ শুনলুম। সেই সময় আলো গেল নিভে। হিরণমামা বলে উঠলেন—এই রে! কোথায় বুঝি ঝড়ে ইলেকট্রিক লাইনের খাম্বা উপড়ে গেল। গত ঝড়েও এমন হয়েছিল। এক সপ্তাহ লেগেছিল মেরামত করতে।

মোমবাতি হাতড়ে জ্বেলে দিলেন হিরণমামা। বাইরে হারাধনের চেঁচামেচি শুনলুম। হিরণমামা বললেন—নিশ্চয় হেরিকেন খুঁজে পাচ্ছে না। এই ভয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। এবার বাইরে বৃষ্টির জোরাল শব্দ শোনা গেল। ঝড় অনেকটা কমেছে।

হিরণমামা ঘরের অন্যপাশে তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বসলেন। আরেকটা মোম জ্বেলে নিজের কাজে ডুবে গেলেন। আমি উত্তরে একটা জানলা ফাঁক করে অন্ধকারে বৃষ্টি দেখার চেষ্টা করলুম। বিদ্যুতের ছটায় বৃষ্টিরেখা দেখতে দেখতে বারবার মনে হচ্ছিল, এই দুর্যোগের রাতে কালিকিঙ্করের গরিলাটা যদি দৈবাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং এই খামারবাড়ির আনাচেকানাচে এসে ওৎ পাতে!

এই অসম্ভব ঘটনা কেন যে আমার মাথায় এল, কে জানে। তারপর যতবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল, মনে হল, যেন জুম্বাকে টলতে টলতে আসতে দেখছি বৃষ্টির মধ্যে। কেমন অস্বস্তিকর চাপা একটা আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল। তখন জানলা বন্ধ করে সরে এলুম।...

বৃষ্টি কমল, তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। কিচেনের বারান্দায় ডাইনিং টেবিলে আজ আর খাওয়া হল না। সব ভিজে ছপছপ করছে। বারান্দা জুড়ে ছেঁড়া পাতা আর ডালপালার আবর্জনা উড়ে এসে জমেছে। মেসিনঘরের দিকে হেরিকেন জ্বলছে। মুকুন্দ আর ঘণ্টা আজ ওখানে শুতে পারবে না। তাই গোডাউনের ভেতর শোবার আয়োজন করছে দেখলুম।

ঢাকুর ডাক শোনা গেল মুর্গির খাঁচার ওদিকে। বুঝলুম, ওখানে সে এখন কড়া পাহারা দিচ্ছে। হারাধনের বিড়াল কিচেনে উনুনের পাশে বসে আছে। হারাধন তার খাড়া শক্ত লেজে তেল দলছে।

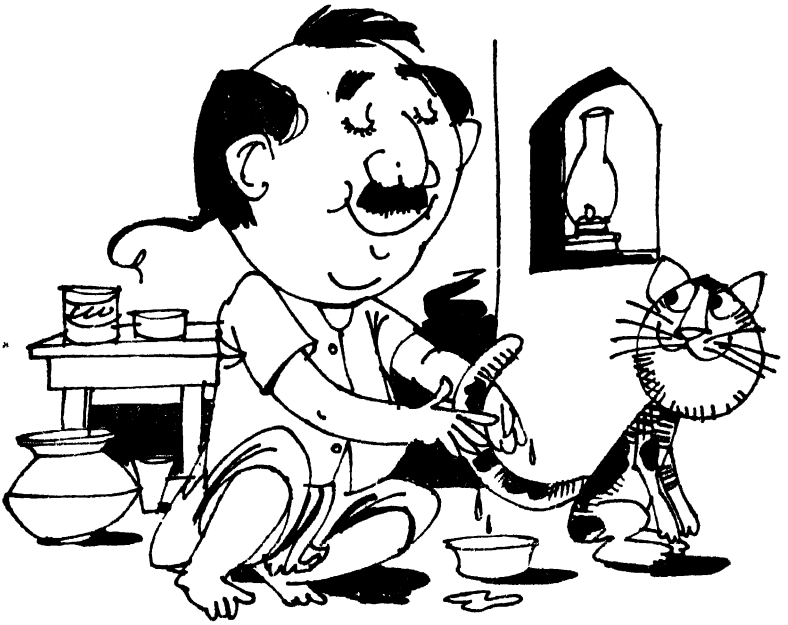

হারাধন তার খাড়া শক্ত লেজে তেল দলছে।

খাওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এইসব দেখে ঘরে ঢুকলুম। হিরণ-মামা চাপা গলায় বললেন—আর ঘণ্টা খানেক পরে বেরুব। তুই এঘরে শো। ফিরে এসে তোকে ডাকব। কিন্তু সাবধান, আমার গলার স্বর চিনে তবে দরজা খুলবি।

উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে রইলাম। হিরণমামা হান্টিং বুটজুতো পরছেন। গায়ে কালো রেনকোট। মাথায় টুপি। রিভলবারের কেস খুলে ছটা গুলি দেখে নিলেন। তারপর চেয়ারে বসে চুরুট ধরালেন। বললেন—তুই শুয়ে পড়। বইটই পড়তে থাক্। এখনও দেরী আছে। তোকে ডাকব'খন। দরজা বন্ধ করে দিবি।

কতক্ষণ পরে উনি দরজা খুলে বাইরেটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন—ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার বেরুচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দে।

বললুম—দাতুয়ার সিং গেটে তালা দিয়েছে যে! ওকে না জানিয়ে যাবেন কী ভাবে?

হিরণমামা হাসলেন।—ও এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ডুপ্লিকেট চাবি আছে, ভাবিস নে।

উনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে বসলুম। তারপর প্রচণ্ড একটা অস্বস্তি আমাকে পেয়ে বসল। একথা ঠিক যে হিরণমামা মানুষ খুন করতে যাচ্ছেন না—যাচ্ছেন একটা সাংঘাতিক হিংস্র জন্তুকে খতম করতে। এতে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু কালিকিঙ্কর মহা ধড়িবাজ লোক যে! যদি হিরণমামাই উল্টে কোনও বিপদে পড়েন!

টেবিলঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। কাঁটাদুটো কি থেমে গেছে? এত অস্বস্তিকর রাত—এমন লম্বা-লম্বা মিনিট আমার জীবনে আর কখনো কাটাতে হয় নি। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আর বৃষ্টির শব্দ নেই। কিন্তু পোকামাকড় আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।

সেই বইটা টেনে নিলুম র‍্যাক থেকে। 'দি প্রি-হিস্টোরিক ম্যান এ্যাণ্ড হিজ ফুড'। ফর্মুলার কথাগুলো পড়ার চেষ্টা করলুম। কিছু বুঝলুম না।

কতক্ষণ পরে দেখি মোমবাতিটা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঘড়ির দুটো কাঁটাই বারোটার ঘরে। রাত বারোটা বাজল।

মোমবাতিটা ক্ষীণ আলো ছড়াচ্ছে। এই সময় দরজায় কেউ টোকা দিল ঠুক্…ঠুক্…ঠুক্! চাপা গলায় বললুম—কে?

চাপা গলায় সাড়া এল—আমি।

হিরণমামা ফিরে এসেছেন! আনন্দে লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ আমার মুখে রুমাল চেপে ধরল। মনে হল, গভীর অতল খাদে গড়িয়ে চলেছি তো চলেছি।

॥ পাঁচ ॥

চোখ খুলে মনে হল, রাতে ঘুমটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। ওঠার চেষ্টা করতেই তোরাবডাক্তারের গলা শুনতে পেলুম—"উহুহুঁ, উঠো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো!"

এমনি মিক্সচার খাওয়ার আতঙ্কেই আমাকে উঠে বসতে হল। দেখি, হিরণমামার বিছানায় আছি। হারাধন, দাতুয়ার, ঘণ্টা, আরশাদ উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘরটার লণ্ডভণ্ড অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে বললুম—হিরণমামা কই, হিরণমামা?

তোরাবডাক্তার ইঞ্জেকশান তৈরিতে ব্যস্ত। হারাধন কাঁচুমাচু মুখে বলল—বড়বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে ফার্মে ডাকাত ঢুকেছিল। হয়তো তারাই ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে।

আরশাদ বলল—ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই কিছু। থানায় খবর দিয়েছি। এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে।

এতক্ষণে দুটো ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। 'প্রি-হিস্টোরিক ম্যান এ্যাণ্ড হিজ ফুড' বইটা নেই এবং মুকুন্দও নেই।

তোরাবডাক্তার বললেন—আরশাদ! ছোটবাবুকে একবারটি ধরো তোমরা।

আমি ছিটকে সরে আসার আগেই আমাকে চেপে ধরে বিছানায় শোয়াল এবং তোরাবডাক্তার আমার ডানবাহুতে ইঞ্জেকশানের ছুঁচ ঢুকিয়ে বললেন—খুব শক্তি হবে গায়ে। চুপ করে পড়ে থাকো।

সেই বিশাল সিরিঞ্জের দিকে আর তাকাবার সাহস ছিল না। চোখ বুজে অত্যাচার সহ্য করলুম।

বাইরে জিপের শব্দ শোনা গেল। দাতুয়ার সিং বলল দারোগা-বাবু আ গয়া।

ঢের পুলিশ অফিসার দেখেছি, কিন্তু এমন দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড কাউকে দেখিনি। মনে হল ভুঁড়ির ওপর বেল্টটার বেড় কমপক্ষে দুমিটারের কম নয়। বুটের শব্দে খামারবাড়িতে ভূমিকম্প হচ্ছিল যেন। এসেই ঢাকের মত গমগমে গলায় বললেন—কই? কোথায় ডাকাত?

আরশাদ সব দেখাল, ঘরের ভেতরকার হুলুস্থুল অবস্থাটা। ওদিকে তোরাবডাক্তার কেন কে জানে, গুটিসুটি কেটে পড়েছেন কোন ফাঁকে। দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই ছোকরা কে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম—আমার নাম টিটো।

আরশাদ আমার পরিচয় দিল। দারোগাবাবু বললেন—তোমাকে ডাকাতরা বেঁধে রেখেছিল বুঝি? ভাল, ভাল। টাকা পয়সা নিয়েছে তো? নেবেই। নৈলে আর ডাকাতি কেন? যাক্‌গে, কোনও চিন্তার কারণ নেই। ওবেলা ডাকাত ব্যাটাদের পাকড়াও করে ফেলব। ওহে আরশাদদা! কই, চলো—তোমাদের পোলট্রিটা একবার দেখেই যাই, এলুম যখন।

দারোগাবাবু পোলট্রির দিকে পা বাড়ালে ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম—আপনি খালি মুর্গি খেতেই এসেছেন দেখছি। মামার খোঁজ করবেন না?

দারোগাবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।—এ তো ভারি বেয়াদপ ছোকরা দেখছি। আমায় বলে কিনা মামা খুঁজে আনতে! তোমার মামা খোঁজা কি আমার কাজ? নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দাও না বাপু!

কিছুক্ষণ পরে দুটো প্রকাণ্ড মুর্গি নিয়ে দারোগাবাবু সদলবলে চলে গেলেন। আরশাদ বলল পাড়াগাঁয়ের দারোগাবাবুদের ব্যাপারস্যাপার এরকমই। টিটো, বড়বাবুর খোঁজে আমাদেরই বেরুনো দরকার। চলো, আমরা কালিকিঙ্করবাবুর ওখানে খোঁজ নিই।

তক্ষুনি জিপ নিয়ে আমরা বেরোলুম। হরিণমারায় জমিদার বাড়ির ফটকের কাছে যেতেই দেখা হল কালকের সেই ভজহরির

সঙ্গে। সে বলল, কালীকর্তার কাছে নাকি? উনি তো চলে গেছেন!

—চলে গেছেন? কোথায় চলে গেছেন? কখন চলে গেছেন?

—সেই ভোরবেলা। জুম্বা খুব বদমাইসি করছিল। তাই ওকে খাঁচাসুদ্ধ একটা ট্রাকে চাপিয়ে কলকাতা নিয়ে গেছেন। বললেন, চিড়িয়াখানায় দান করবেন।

আরশাদ আমার দিকে তাকাল। বললুম—চলো, ফেরা যাক।

ফিরে আসার পথে আরশাদ ফের বলল—টিটো! কালিকিঙ্কর নির্ঘাৎ বড়বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। চলো, আমরা কলকাতা রওনা

দারোগাবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। [পৃঃ ৫৬

দিই। সেখানে গেলে ওনার বন্ধুদের জানিয়ে উদ্ধারের একটা উপায় হবে। এই অখদ্যে গাঁয়ে মাথা ভাঙলেও কোনও ব্যবস্থা হবে না।

সায় দিয়ে বললুম—ঠিক বলেছ আরশাদদা। তাছাড়া মামা আমায় একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, কোনও বিপদ ঘটলে এই ভদ্রলোকের কাছে যাবি।

আমাদের জিপ আর ফার্মে ঢুকল না। হাইওয়ের দিকে ঘুরল। হাইওয়েতে পৌঁছে জিপের গতি বাড়িয়ে দিল আরশাদ। ঘণ্টায় কখনও আশি, কখনও একশো মাইল বেগে আমরা কলকাতার দিকে ছুটে চললুম।

বর্ধমানে পৌঁছে একটা হোটেলে খেয়ে নিয়েছিলুম। তারপর জি টি রোড ধরে যখন হাওড়া পৌঁছলুম, তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। ভীষণ ট্রাফিক জ্যাম। এলিয়ট রোডের নির্দিষ্ট বাড়িটি খুঁজে তিনতালার দরজায় যখন কড়া নাড়লুম, তখন সাড়ে ছটা। আকাশে দিনের আলোর আভাস থাকলেও নীচে আবছা অন্ধকার এবং বাতি জ্বলে উঠেছে সবখানে।

একটা লোক দরজা খুলে বলল—কাকে চাই?

বললুম—কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে।

—আপনারা বসুন। ওঁকে খবর দিচ্ছি।

ভেতরের ঘরে সোফায় বসে থাকতে থাকতে ওপাশের পর্দা তুলে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে হাঁ করে তকিয়ে রইলুম।

খ্রিসমাসের সেই সান্তাক্লজ বুড়ো নাকি? অবিকল তেমনি সাদা দাড়িগোঁফ মুখে, তেমনি ফর্সা টুকটুকে গায়ের রঙ। তবে মাথা ভর্তি টাক আছে এই যা। নাম শুনে ভেবেছিলুম, দিশী সায়েব—কিন্তু এ যে খাঁটি ইউরোপীয়ান মনে হচ্ছে। আর কী অমায়িক মিষ্টি হাব-ভাব। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। মনে মনে ভাবলুম তাহলে কি পাদ্রীবাবার ঠিকানা দিয়েছিলেন হিরণমামা? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? উনি যে সামরিক উপাধিধারী! কর্নেল!

কর্নেল সায়েব আমার দিকে তাকিয়েই কতকালের চেনা মানুষের মতো হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো মার্শাল টিটো!

আমি হ্যাণ্ডশেক করে বললেম—আমায় আপনি চেনেন?

—দেখেই চিনেছি!

—আশ্চর্য তো!

—মোটেও আশ্চর্য নয় ডার্লিং! কালই হিরণবাবুর চিঠি পেয়েছি।

তাতে উনি লিখেছেন, খুব শিগগির আমার ভাগ্নে টিটোকে আপনার কাছে পাঠাব। তাছাড়া তোমার বিশদ পরিচয়ও দিয়েছেন। তুমি ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলে জিভারোদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেছিলে, তাও জানিয়েছেন। সাবাস টিটো! আমি তোমার মতো ছেলেদের ভীষণ পছন্দ করি। তোমায় দেখে খুব খুশি হয়েছি।

কর্নেলবুড়ো আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

একটু পরে সংক্ষেপে যা যা ঘটেছে, ওঁকে জানালুম। শুনে কর্নেল গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন—হুম্। চিন্তা করো না টিটো। আপাতত তুমি আমার অতিথি। বিশ্রাম করো। না, না, বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। ফোন করে দাও বাড়িতে। আর, তুমি···

আরশাদের দিকে ঘুরে বললেন--তুমি বরং হিরণবাবুর বাড়ি গিয়ে ওঁর আত্মীয়স্বজনকে খবর দাও। হরিণমারা ফার্মে ওঁরা গিয়ে দেখাশুনা করুন। জিনিসপত্র চুরি হবার আশঙ্কা আছে।

আরশাদ চলে গেল। কর্নেল আমার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালুম। এও দেখছি হিরণমামার এক জুড়ি। তেমনি ল্যাবরেটরি শুধু নয়, জার আর কাঁচের খাঁচায় ভর্তি হরেক রঙা প্রজাপতি, ফড়িং, মাকড়শা ইত্যাদি পোকামাকড়! আর কাঁড়ি-কাঁড়ি বই! মামার উপযুক্ত দোসর। অবাক হয়ে বললুম—আপনিও দেখছি মামার মতো পোকারোগে ভুগছেন।

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন।—বেড়ে বলেছো ডার্লিং টিটো! ওই দেখ, তোমার মামার গবেষণার সেই প্রাণীটি, সিস্টোমার্কা গ্রেগারিয়া। সাহারা মরুভূমির পঙ্গপাল!

বুঝলুম বুড়োর আদর করে ডার্লিং বলার অভ্যাস আছে। খুব ভাল লাগছিল ওঁকে। ল্যাবরেটরির ওপাশের ঘরে নিয়ে বললেন—বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ। আমি ঝটপট কিছু কাজ সেরে নিই। তারপর প্ল্যান করে ফেলব। হ্যাঁ, বাড়িতে ফোন করে বলে দাও, এখানে থাকছ। আর, বাড়তি জামাকাপড় পাঠিয়ে দিতে বলো বরং।

আমি ফোন করে জানিয়ে দিলুম। ফোন ধরেছিল আমার বোন ঋতু। সে বলল, এইমাত্র আরশাদ গিয়ে সব বলেছে। বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। বাবা চলে গেছেন আরশাদের সঙ্গে বালিগঞ্জে হিরণমামাদের বাড়িতে।

বললুম—ঠিক আছে। আমার জন্য ভাবিস নে। আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের বাসায় থাকছি। কাল সকালে একবার বাড়ি যেতে পারি। বুঝতেই পারছিস, আমি কত ব্যস্ত।

ফোন রাখতে যাচ্ছি, ঋতু ডাকল—এই দাদা! শোন্ শোন্!

—কী রে?

—দ্যাখ, হঠাৎ কীসব মনে পড়ে গেল। তোর ওই কর্নেল ভদ্রলোকের নামটা আমার চেনা লাগছে কেন বল্‌তো?

—তা আমি কেমন করে জানব?

—দাদা! মনে পড়েছে!

—কী?

—উনি সেই বিখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দা না? এই তো গতমাসে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বিরাট খবর বেরিয়েছিল···

বাধা দিয়ে বললুম—থাম্। আমি ব্যস্ত। তারপর ফোন রেখে দিলুম। হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে পড়ে গিয়েছিল। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। তাই তো! মাঝে মাঝে খবরের কাগজেই এই গোয়েন্দা কর্নেলের অদ্ভুত-অদ্ভুত কীর্তিকলাপ বেরোয়! আমাদের বাড়িতে তা নিয়ে কত আলোচনা হয়। অথচ সব ভুলে বসে আছি।

আসলে হরিণমারা ফার্মে ওই দুর্ঘটনার পর আমার মাথার ঠিক ছিল না। এতক্ষণে সব মনে পড়ে গেল। কর্নেলের দিকে তাকালুম।

বুড়ো মিটিমিটি হেসে বললেন—কী ভাবছ টিটো? ভাবছ, এ বুড়ো কীভাবে তোমার মামাকে উদ্ধার করবে, তাই না?

—মোটেও না। আপনি যে সেই বিখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দা, তা ভুলে গিয়েছিলুম। তাই নিজের ওপর রাগ হচ্ছে।

—ও কিছু না। তুমি বিশ্রাম করো।...বলে উনি ডাকলেন —ষষ্ঠি! ষষ্ঠিচরণ।

সেই লোকটা এসে বলল—খোকাবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা তো? হচ্ছে।

কর্নেল ফোনের কাছে গেলেন। তারপর ফোন তুলে চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। আমি একটা বিলিতী পত্রিকার

তারপব ফোন তুলে চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন।

পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের লেখা একটা প্রবন্ধ। বুড়ো লেখেনও দেখছি।

আরও অবাক হলুম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উনি আফ্রিকায় সাহারা অঞ্চলে ছিলেন—তখনকার বিবরণ লিখেছেন। আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকলুম।

একটু পরে ষষ্ঠিচরণ প্লেটভর্তি স্ন্যাক্স আর একপট কফি রেখে গেল।

কর্নেল ফোনের কাছে বসে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—খেয়ে নাও ডার্লিং! খালি পেটে বুদ্ধি খোলে না। কাজের উৎসাহ আসে না।

ক্ষিদে পেয়েছিল। খাওয়া শেষ করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি, কর্নেল আমার পাশে এসে বসলেন। বললেন—হুম্, কালই ডক থেকে একটা জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে। যাবে ভূমধ্যসাগর হয়ে প্লিমাউথ বন্দরে। আলজিয়ার্স হয়ে যাবে। মালবাহী জাহাজ। কে কে চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক ওতে যাচ্ছেন কিছু মালপত্র নিয়ে। মেসিনটুলসের কারবার আছে নাকি। বিদেশে রফতানি করেন।

বললুম—সব চালাকি।

কর্নেল হাসলেন।—তা আর বলতে! ওর মালপত্র সব বুক হয়ে গেছে। বড় বড় কাঠের বাক্সে মেসিন ভরা আছে বলল। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি। রপ্তানির লাইসেনস্ও আছে।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—নিশ্চয় মামাকে কাঠের বাক্সে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। দম আটকে যাবে না মামার?

কর্নেল বললেন—ওঁকে প্রাণে মারলে কালিকিঙ্করের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কাজেই ওঁকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা সে করবেই।

মামাকে উদ্ধার করবেন না?

—চিন্তা কোরো না। আপাতত জাহাজটা আর আটকানোর উপায় দেখছি না। চেকিং হয়ে গেছে। কালই রওনা দেবে সকালে।

—তাহলে উপায়?

—আছে। জাহাজ আলজিয়ার্স পৌঁছুতে একমাস লাগবে। নানান বন্দরে মাল খালাস করতে-করতে যাবে কি না। ততদিনে আমরা পাসপোর্ট-ভিসা করিয়ে নিতে পারব। ডঃ প্রদীপশঙ্করের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখব। আমরা প্লেনে যাব। ভেবো না।

সে রাতে কর্নেলবুড়ো ওঁর জীবনের বিচিত্র সব এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শোনালেন। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। একবার হিরণমামার

সঙ্গে ভারতমহাসাগরের এক অজ্ঞাত দ্বীপের দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন। ঝড়ে জাহাজ গিয়ে পড়েছিল একেবারে কুমেরুমহাদেশ এ্যাণ্টার্কটিকায়। তখন তোমার বয়স দশবারো বছর হবে! মনে পড়ল, হিরণমামা গল্পটা বলেছিলেন। কর্নেলের কথাও বলে থাকবেন। ভুলে গিয়েছিলুম। এখন সব মনে পড়ে যাচ্ছিল।

শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে গেছি। স্বপ্নে দেখলুম, হিরণমামা আর আমি দেঁতো গরিলা জুম্বাকে তাড়া করেছি। জুম্বা পালাচ্ছে। তারপর সে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। মামা হাসতে হাসতে বললেন—খুব ভয় পেয়েছিল জুম্বা! আয় টিটো, এবার আমরা গুপ্তধনের সন্ধানে যাই।

ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে আসছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। জানলার ওপাশে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছে কাকের ঝাঁক কলরব করছে।...

* * * *

পাসপোর্ট-ভিসা এবং নানান আয়োজনে পনেরদিন লেগে গেল। কর্নেলের সঙ্গেই কাটিয়েছি দিনগুলো। তারপর এল ৭ মে—আমাদের রওনা হবার দিনটি। অজানা দেশে অভিযানের নেশায় রক্ত নেচে উঠল।

দমদম থেকে রাত আটটায় আমাদের বিমান ছাড়ল। কায়রোতে নামল শেষ রাতে। কিছুক্ষণ পরে আবার ডানা মেলল। নীচে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে সাদা ফেনা ঝকঝক করছিল উজ্জ্বল রোদে। আকাশ পরিষ্কার। আলজিয়ার্সে যখন পৌঁছলুম, তখন দুপুর।

কী প্রচণ্ড গরম! বাতাসে আগুনের হল্কা। বুঝলুম এখানকার লোকেরা কেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত পোশাকে ঢেকে রাখে। গাছপালা বলতে কয়েকটা পামগাছ বা খেজুর। চারদিক ন্যাড়া ধু ধু। এয়ারপোর্টে ডঃ প্রদীপশঙ্কর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন গাড়ি নিয়ে। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ তিরিশ বত্রিশ। মুখে কালিকিঙ্করের সামান্য আদল আছে। কিন্তু কী বিপরীত চরিত্রের মানুষ।

থাকেন মাইল পঞ্চাশ দূরে 'আল-গোলেয়া' নামে একটা জায়গায়। রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে চলেছে পীচের রাস্তা। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি কিংবা ন্যাড়া পাথরের পাহাড়। পথে আববরা উট ঘোড়া খচ্চরের পাল নিয়ে চলেছে। নাক ঢাকা। খালি চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

'আল-গোলেয়া' ছোট্ট একটা শহর। কিছু কলকারখানা রয়েছে। একটা লেক দেখতে পেয়ে চোখ জুড়োল। দিগন্তবিস্তৃত লেকে অজস্র পালতোলা নৌকা ভাসছে। আরবদের 'ধৌ' নৌকো।

পামগাছে ঘেরা একটা সুন্দর বাংলোয় প্রদীপশংকর একা থাকেন। এই মরু এলাকায় লেকটা থাকায় এখানে প্রচুর সবুজের চিহ্ন চোখে পড়ে। বিশ্রাম নেওয়ার সময় প্রদীপশংকর বললেন—দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি শুরু হয়েছে। তবে অনেকের ধারণা যে সাহারা মানে খালি বালির দেশ, তা কিন্তু সত্যি নয়। বালি বলতে মোটে তিনভাগের একভাগ বড়জোর। বাকি এলাকা খালি ন্যাড়া পাহাড়, নুড়িপাথর আর রুক্ষ মাটি। ঝোপ-জঙ্গলও কম নেই। কোনও এলাকায় নদী এবং রীতিমতো জলাও আছে—যাকে বলে মার্শল্যাণ্ড। প্রচণ্ড বন্যায় সাহারার অনেক এলাকা বর্ষার সময় ডুবেও যায়। কাজেই সাহারাকে নিছক মরুভূমি বললে তার ওপর অবিচার করা হবে।

কর্নেল বললেন—জানি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাহারা রীতি-মতো দুর্গম অরণ্য ছিল। পাহাড়ের মধ্যে পাথরের খাঁজে কত বন্য প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। বড় বড় গাছের ফসিলও পাওয়া গেছে। যাক্‌গে তাহলে এবার প্ল্যান করা যাক্। 'সেণ্ট টমাস' জাহাজ পৌঁছুবে বলছেন আঠারো মে। এত শিগগির!

প্রদীপশঙ্কর বললেন—তাই তো বললেন ডক-কর্তৃপক্ষ। সুয়েজ খাল কবে খুলেছে। কিন্তু ওখানে কোনও বন্দরে নোঙর করতে দিচ্ছে না। আরব-ইজরায়েল গোলমাল নাকি এখনও পুরো মেটেনি। কাজেই 'সেণ্ট টমাস' এডেন থেকে সোজা আলজিয়ার্সে এসে ভিড়বে। হাতে দশদিন সময় পাচ্ছি। চিন্তার কারণ নেই। আপনারা আগে পোশাক বদলে স্নানটান করে সুস্থ হোন।

॥ ছয় ॥

আলগোলেয়া শহর থেকে কর্নেল আর আমি চলে এসেছি প্রায় একশো মাইল দূরে। একটা রুক্ষ পাহাড়ী উপত্যকায় তাঁবু পাতা হয়েছে দুটো। একটাতে আছি কর্নেল ও আমি। অন্যটায় প্রদীপশঙ্করের দুজন লোক। তারা আরব। একজনের নাম মুরাদ, অন্যজনের নাম হাসান। হাসান আমারই বয়সী। সে রান্নার কাজটা ভালই পারে। প্রদীপশঙ্করের কাছে অনেকদিন আছে বলে একটু-আধটু বাংলাও বলতে পারে। ওকে পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ছেলেটি কথায় কথায় হাসে। খুব আমুদে। মোটাসোটা নাদুস-নুদুস চেহারা।

আর মুরাদের বয়স প্রায় তিরিশ-বত্রিশ। স্বাস্থ্যবান ঢ্যাঙা লোক। সে নাকি আমাদের প্রহরী।

তবে তার চেয়েও বড় কথা, সে সাহারার সব আদিম উপজাতির ভাষা মোটামুটি জানে। কাজেই তাকে পেয়ে আমাদের ভালই হয়েছে।

মুরাদ ফরাসী আর ইংরেজিতেও পাকা। আমাদের সঙ্গে সে ইংরেজিতে কথা বলে।

এখানে চলে আসার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কর্নেল প্রদীপশঙ্করের সঙ্গে কী সব গোপন পরামর্শ করে এখানে চলে এসেছেন। আমি জিগ্যেস করলে শুধু বলেছেন—'সেণ্ট টমাস' জাহাজ আলজিয়ার্স বন্দরে পৌঁছুতে দেরী আছে। ততদিনে কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখি।

কী কাজ, তা বুঝতে পারছি না।

তাঁবু থেকে একটু দূরে পাহাড়ের ঢালে একটা ঠাণ্ডা জলের ছোট্ট প্রস্রবণ আছে। তাই দেখছি, আরব যাযাবর পশুপালকরা ওখানে

ভেড়া, দুম্বা, ঘোড়া, উটকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে এবেলা ওবেলা। হাসানের কাছে জেনেছি, ওরা থাকে সামনের পাহাড়টার ওপাশে। প্রস্রবণের জল ওদিকে ছোট্ট নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। তাই সবুজ ঘাস আর কাঁটাঝোপের অভাব নেই। জানোয়ারগুলো সেখানে চরে বেড়ায়। ওরা ছোট-ছোট তাঁবু বানিয়ে থাকে। তাঁবুগুলো চামড়ার!

দুপুরে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, কর্নেল মুরাদকে নিয়ে ওদের তাঁবুতে গেছেন ঘোড়া কিনতে। ঘোড়া কেনার কারণ আমি জানিনে। যেতে চেয়েছিলাম ওঁদের সঙ্গে। কর্নেল বলে গেলেন—না টিটো। তোমার এখানে তাঁবু পাহারা দেওয়া দরকার। হাসান একেবারে গোবেচারা ছেলে। ওর ওপর ভরসা রাখা যায় না।

প্রদীপশঙ্কর আমাদের কয়েকটা রাইফেল, রিভলবার আর প্রচুর গুলি যোগাড় করে দিয়েছেন। এসব জিনিস এদেশে গোপনে যোগাড় করার অসুবিধে নেই। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে অজস্র আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান হয়।

একটা রিভলবার সবসময় আমি কোমরের বেল্টে আটকে রেখেছি। পাশে গুলিভরা একটা রাইফেলও তৈরি রেখেছি। চোখে বাইনোকুলার রেখে কর্নেল ও মুরাদের চলে যাওয়া দেখছিলুম। ওঁরা হাঁটতে-হাঁটতে দূরে দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে সংকীর্ণ দরিপথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেইসময় হঠাৎ চোখে পড়ল, প্রস্রবণের পাশে একটা বড় পাথরের আড়ালে কে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার মতোই চোখে বাইনোকুলার রেখে যেন ওঁদেরই দেখছে। পাথরের আড়ালে একটা ধূসর রঙের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে—লেজ না নাড়লে তাকে দেখতেই পেতুম না।

আমার চমক লাগল। লোকটা কে? পোশাক আরবদের মতো নয়—কিন্তু ওর চেহারা বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মুখটা আরবদের মতো। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে একটা রাইফেলও আটকানো রয়েছে।

দরিপথে কনেলরা পাহাড়ের ওপাশে চলে গেলে লোকটা এবার এগিয়ে গেল প্রস্রবণের কাছে। পাথরে বাঁধানো জলে ভরা কুয়ো থেকে আঁজলায় জল তুলে মুখ ধু'ল এবং খেল।

হাসান ওদের তাঁবুর মধ্যে স্টোভ জ্বেলে খরগোসের মাংস রান্না করছিল। খরগোসটা সকালে মুরাদ শিকার করে এনেছে।

হাসান ওদের তাঁবুর'মধ্যে স্টোভ জ্বেলে খরগোসের মাংস রান্না করছিল।

তাঁবুর সামনে গিয়ে বললুম—হাসান, দেখ তো ঝর্ণার কাছে লোকটা কে ?

হাসানের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলি আমরা। হাসান আমার কথা শুনে ফিক করে হেসে বলল—মনুস।

হাসতে হাসতে বললুম—'মনুস' তো। কিন্তু ও কে দেখবে তো ?

হাসান তাঁবুর দরজার বাইরে মুখ বের করে দেখে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলল—টিটো, টিটো! ও একজন ডাকু। ওর নামে

সরকারী পরোয়ানা আছে। ওকে জ্যান্ত বা মরা অবস্থায় যে ধরে দিতে পারবে, সে অনেক টাকা বখশিস পাবে।

—বলো কী? ওর নাম?

হাসান উত্তেজনা চেপে বলল—ওর নাম বিলকাদ। সেবার শহরে গিয়ে হামলা করেছিল। অনেক লুঠপাট করেছিল। খুন-জখমও হয়েছিল বিস্তর। জানো টিটো? ওর দলে কমসে কম পাঁচশো ডাকু আছে?

অবাক হয়ে ফের বাইনোকুলার তুলে লোকটাকে দেখতে থাকলুম। সে জল খেয়ে ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

হঠাৎ ঝোঁক চাপল, লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আসব নাকি? আমার কাছে তো অস্ত্রশস্ত্র আছে। অবশ্য আমি তার শত্রু নই, সেও আমার শত্রু নয়। কেনই বা সে আমাকে আক্রমণ করবে? যদি ওর তেমন মতলব থাকত, পাথরের আড়াল থেকে কখন গুলি করে বসত আমাকে।

বললুম—হাসান, আমি ওর কাছে যাচ্ছি।

হাসান আঁতকে উঠে আমার হাঁটুর কাছটা দুহাতে চেপে ধরল। —তুমি কি পাগল হয়েছ টিটো? বিলকাদ ডাকুকে চেনো না। ওর সামনে গেলে তোমার বাঁচোয়া নেই।

দেখলুম, হাসান আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। অথচ লোকটার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে চেপে রাখতে পারছিনে! এ আমার বরাবর স্বভাব। হিরণমামা বলেন—আমাজনের জঙ্গলে জিভারোদের সংগে তিনমাস কাটিয়ে টিটো একেবারে জিভারোদের মতো স্বভাব পেয়েছে। একবার জিদ চাপলে ওকে থামানো কঠিন।

হাসান এত জোরে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আছে যে ওর সংগে রীতিমতো জুডোর লড়াই না দিয়ে নিজেকে ছাড়ানো অসম্ভব। সেটা দুজনের পক্ষেই বিশ্রী ব্যাপার। বেচারা সাদাসিদে এবং আমুদে ছেলে। আমার সঙ্গে এত ভাবও হয়ে গেছে!

তাই শেষ অব্দি চিৎকার করে লোকটাকে ডেকে উঠলুম—হ্যাল্লো-ও-ও বিলকাদ! হ্যাল্লো—ও—ও—ও!

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর রাইফেলটা জিন থেকে দ্রুত খুলে নিয়ে যেন তৈরী হল। হাসান সঙ্গে সঙ্গে পা ছেড়ে দিয়ে তাঁবুর কোণায় চলে গেছে। মুখ ফিরিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। বিড়বিড় করে কীসব বলছে ওর মাতৃভাষায়।

ফের চেঁচিয়ে বললুম—হ্যাল্লো—ও—ও! উই আর ফ্রেণ্ডস। নট ইওর এনিমি। প্লীজ কাম হেয়ার! ওহে, আমরা তোমার বন্ধু, শত্রু নই। চলে এস এখানে।

লোকটা কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর একলাফে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর অজস্র পাথর ডিঙিয়ে অসমতল কয়েকটা জায়গা পেরিয়ে যেন পক্ষিরাজে চেপে হাজির হল তাঁবুর সামনে। ঘোড়াটা কী শিক্ষিত! ছুটে আসতে আসতে আচমকা থেমে গেল নিঃশব্দে। বিলকাদ আমাকে দেখতে থাকল।

রোগা ঢ্যাঙা লোকটা যে ডাকাতের সর্দার, বিশ্বাস করতে বাধে।

হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করে বললুম—অস্‌সালামু আলাইকুম্!

এই আরব্য ভদ্রতা আমাকে কর্নেল ও প্রদীপশঙ্কর শিখিয়ে দিয়েছেন। এদেশের লোকেরা মুসলমান। এভাবে সম্ভাষণ করলে তারা খুশি হয়। কথাটার মানে, তোমার ওপর ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক।

বিলকাদ ঘোড়া থেকে নেমে আস্তে বলল—আলাইকুম আস্‌সালাম।

হাত বাড়িয়ে দিলুম। সেও হাত বাড়াল। এই করমর্দনের রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত। তারপর ইংরেজিতে বললুম—তুমি আমাদের অতিথি।

এতক্ষণে বিলকাদ খিকখিক করে হেসে উঠল। বলল—তুমি দেখছি আমার ছোট ছেলের বয়সী! তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি না, কোন দেশের লোক তোমরা।

—আমরা ভারতীয়।

বিলকাদ খুশি হয়ে বলল—ও! ইন্দু, ইন্দু!

—ইন্দু না, হিন্দু।

—হিন্দু। তোমাদের দেশে কখনও যাইনি। শুনেছি, তোমরা খুব ভাল লোক।

—মিঃ বিলকাদ, চা না কফি খাবে, বলো?

—চা আছে নাকি? বিলকাদ প্রায় নেচে উঠল। দাও, চা খাব।

আমাদের তাঁবু থেকে দুটো চেয়ার নিয়ে রোদেই বসলুম। প্রচণ্ড গরম। কিন্তু ওকে তাঁবুর ভেতর ঢোকাতে সাহস পেলুম না। রাইফেলের বাকসো দেখলে কী করে বসবে বলা যায় না।

হাসানের ভয় ততক্ষণে কেটেছে কিছুটা। সে চা তৈরি করতে ব্যস্ত হল। শুনেছিলাম, আরবরা কফিরই ভক্ত। সে-কফি আমাদের পক্ষে মুখে দেওয়া অসম্ভব—এত তেতো। কিন্তু ওরা মুখ বদলাতে মাঝে মাঝে চা খায়।

বিলকাদ আমাদের পরিচয় জিগ্যেস করল। ওই বুড়ো ভদ্রলোক কে, তাঁর সঙ্গে যে আরবটা গেল, সেই বা কে। এবং আমিই বা কে। কেন এখানে এসেছি।

জানালাম, আমরা এই এলাকায় অভ্র খনির খোঁজে বেড়াচ্ছি। খনির খোঁজ পেলে কারখানা করব। কর্নেলের কথামতো আরও অনেক কিছু মিছেকথা বলে ফেললুম।

বিলকাদ বুদ্ধিমান। সে একটু হেসে বলল—কিন্তু আমার নাম জানলে কী ভাবে? আমাকে তোমরা দূরের কথা, এদেশের খুব কম লোকই চেনে। খালি মরুভূমির যাযাবররা ছাড়া।

বিব্রত হতে হল। হাসান ওকে চেনে বললে যদি হাসানের কোনও ক্ষতি করে বসে! তাই বললুম—কেন? তোমার ছবি আলগোলেয়া শহরে টাঙিয়ে দিয়েছে সবখানে!

বিলকাদ গম্ভীর হয়ে গেল।—ও। বুঝেছি! তাহলে আমার সম্পর্কে সবই জানো?

—আলবাৎ জানি, মিঃ বিলকাদ।

—দেখ হিন্দু ছেলে, তুমি আমাকে ডেকেছ। অতিথি বলে খাতির করছ। তবে সেজন্যেও নয়, তুমি আমার ছোটছেলে হারুনের বয়সী। তাই আমি এভাবে তোমার কাছে এলুম। কিন্তু হুঁশিয়ার, আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তার শাস্তি মৃত্যু।

বিলকাদের মুখটা বদলে গিয়েছিল। হিংস্র নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল তাকে। আমি ওকে খুশি করার জন্যে বললুম—মিঃ বিলকাদ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার একটুও ক্ষতি করব না আমরা। আমরা বিদেশী। তোমাদের দেশের ব্যাপারে নাক গলানোর কী দরকার?

হাসান চাপা গলায় বলল—চা হয়েছে।

বিলকাদকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে সে ছোঁ মেরে নিল। চুমুক দিয়ে বলল—তোফা হয়েছে!

—তোমার ছোট ছেলের কথা বলো মিঃ বিলকাদ!

বিলকাদ মাথা দুলিয়ে জবাব দিল—সে বেঁচে নেই। গত মাসে আমার বউ আর দুই ছেলেকেই শহরের পুলিশ গুলি করে মেরেছে। ওদের একটা তুয়ারেজ বস্তীতে রেখে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, ওদের কবর দেওয়া হয়েছে।

—সে কী!

বিলকাদের মুখে কোনও শোকদুঃখের চিহ্ন দেখলুম না। সে তারিয়ে-তারিয়ে চা শেষ করে বলল—আর এক কাপ হবে নাকি?

হাসান সাহস পেয়ে বলল—আছে সর্দার! এই নিন।

বিলকাদ চা নিয়ে বলল—তুই কোথায় থাকিস?

—আলগোলেয়া শহরে।

—হুঁশিয়ার! আমার কথা কাকেও বললে মারা পড়বি। হাসান তক্ষুনি জোরে মাথা নেড়ে জানাল, কক্ষনো বলবে না। আমি বললুম—মিঃ বিলকাদ তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে?

বিলকাদ হঠাৎ তার বাইনোকুলারটা চোখে রেখে দূরে এদিকে

ওদিকে কী দেখে নিয়ে বলল—আহাজ্জার এলাকায় কোনও তাঁবু পড়লে নিজেই দেখতে আসি, পুলিশের তাঁবু নাকি। আমার বউ ছেলেদের খুন করার প্রতিশোধ নিজের হাতে নিতে চাই।

সে দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। বললুম—কী দেখছ মিঃ বিলকাদ?

—তোমাকে। তোমার নাম কী?

—টিটো।

—হিন্দু টিটো!

—হিন্দু কেন? শুধু টিটো।...বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

হঠাৎ বিলকাদ আমাকে দুহাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে বুকে টেনে নিল। তারপর আমার কপালে চট্টাস্ করে একটা চুমু দিয়ে ধরা গলায় আরবি ভায়ায় বলল—মাশাল্লাহ! শুক্‌রিয়া!

তারপর এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। লোকটা ডাকাতের সর্দার। কিন্তু মানুষ। তাই তার মনে স্নেহ বাৎসল্যও বড় কম নেই। আমার বয়সী হারুন নামে তার একটা ছেলে ছিল। তাকে সে নিশ্চয় সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। আমার মধ্যে সে কি মৃত ছেলেকে দেখতে পেল? তা না হলে অন্য কিছু ঘটত।

কতক্ষণ পরে কর্নেল ও মুরাদ ফিরে এলেন। সঙ্গে প্রায় একপাল ঘোড়া আর দুজন আরব্য উপজাতীয় লোক। তাদের মুখে একটা কালো কাপড় ঢাকা। খালি দুটো ফুটো রয়েছে চোখের সামনে। এই অদ্ভুত মুখোস কেন রে বাবা?

পরে জানতে পারলুম সব। ঘোড়া আনা হয়েছে সাতটা। তবে কেনা নয়। ভাড়ায়। ঘোড়াগুলোর দেখাশুনা করবে ওই লোকদুটো। ওরা তুয়ারেজ উপজাতির লোক। পঙ্গপাল, ফড়িং, 'সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া' থেকে নেশার ওষুধ তৈরি করতে জানে ওই উপজাতির লোকেরা।

তারপর বিলকাদের কথা বললাম। শুনে কর্নেল অবাক হয়ে গেলেন। শেষে বললেন—তবে ভালই হল। বিলকাদ যদি তোমাকে স্নেহ করে, জানবে—সারা সাহারায় আমরা নিরাপদ। বরং তার সাহায্যও দরকার হলে পাওয়া যাবে।

মুরাদ কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। বিলকাদের মেজাজ-মর্জির নাকি ঠিক থাকে না। খুব খামখেয়ালী লোক। তাছাড়া তার দলের লোকেরা নাকি আসলে ভাড়াটে সৈন্য। তাদের কাছে কামান-মেসিনগানও আছে। বিলকাদের উদ্দেশ্য যে শুধু লুঠপাট, তা নয়। সে দেশের ক্ষমতা দখল করতেই চায়।

কর্নেল বললেন—হুম্! শুনেছিলুম, আসলে বিলকাদ একজন

কর্নেল বললেন—হুম্! শুনেছিলুম, আসলে বিলকাদ একজন বিপ্লবী। আরব উপজাতির সে নেতা।

বিপ্লবী। আরব উপজাতির সে নেতা। সরকার তাকে নিছক ডাকাত বলে প্রচার করছেন।

এসব শুনে বিলকাদের সম্পর্কে আরও আগ্রহ বেড়ে গেল।...

বিকেলে কর্নেল বললেন—টিটো, আজ সন্ধ্যায় আমরা আরও মাইল কুড়ি দক্ষিণে এগোব।

বললুম—ব্যাপারটা কী খুলে বলবেন কর্নেল?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—ডার্লিং, বুঝতে পারছি, তোমার মামার জন্যে তুমি খুব উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের কারণ নেই। হিরণবাবুর ক্ষমতায় আমার বিশ্বাস আছে। তিনি কালিকিংকরের খপ্পর থেকে দেখবে নিজেই উদ্ধার হয়ে বেরুবেন। ভেবো না। তাছাড়া, প্রদীপশঙ্করকে তো সব বলাই আছে।

—কিন্তু আমরা এভাবে যাচ্ছিটা কোথায়?

—সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়ার আবাস ভূমিতে।

—তার মানে?

—এই ফড়িংগুলো যাযাবর বুনো হাঁসের মতো। এরা বসন্তকালে ডিমপাড়ে। বাচ্চা বেরোয়। তারপর গ্রীষ্মের শেষাশেষি ঝাঁক বেঁধে দক্ষিণে উড়ে যায়। আফ্রিকার শস্য এলাকায় গিয়ে হানা দেয়। বর্ষার পর চলে যায় সোজা পূর্ব-উত্তর দিকে। তারপর তারা দক্ষিণে এগিয়ে ভারতে ঢোকে। এভাবে প্রতিবছর তারা চক্কর মেরে ঘোরে এবং শীতের সময় ফিরে আসে সাহারায়। আমরা যাচ্ছি আহাজ্জার নামে একটা জায়গায়। সেখানে একটা জলাভূমি আছে। কয়েকশো বর্গমাইল বিলখাল নদী ও জঙ্গল আছে সেখানে।

—সাহারা মরুভূমিতে এমন জায়গা থাকে নাকি? অবাক হয়ে বললুম।

—আছে বই কি। স্বচক্ষেই দেখবে চলো!

সন্ধ্যার আগেই তাঁবু ও জিনিসপত্র গুটিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপানো হল। আমরা যে পথে যাব, সেপথে বালিয়াড়ি নেই। পাথুরে রুক্ষ মাটি ধু ধু করছে। তাই উটের বদলে ঘোড়ার ব্যবস্থা। রওনা হলুম যখন, তখন পূবের পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

একজন তুয়ারেজ সবার আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। সবার পিছনে দ্বিতীয় তুয়ারেজ মালপত্র ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনছে। পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় কর্নেল ও মুরাদ, তাঁদের পেছনে আমি ও হাসান পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায়। পথপ্রদর্শক তুয়ারেজটি গান গেয়ে উঠল।

একটু পরে দূরে একটা আলো দেখা গেল। অমনি গান থামিয়ে পথপ্রদর্শক লোকটি চেঁচিয়ে কী বলে উঠল। ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে গেল। কর্নেল বললেন—কী হয়েছে মুরাদ? কী হয়েছে? ও কী বলছে?

মুরাদ চাপা গলায় বলল—একটা আলো আসছে। তৈরি থাকুন সবাই।...

॥ সাত ॥

বাঁদিকে উঁচু-উঁচু মস্তো পাথর রয়েছে। কর্নেলের নির্দেশে আমরা সেগুলোর আড়ালে চলে গেলুম। ঘোড়া থেকে নেমে তৈরী হয়ে রইলুম। দরকার হলে গুলি ছুড়তে হবে, কিংবা গতিক বুঝলে পিঠটান দিতেও হবে। আগেই এসব কথা হয়ে আছে।

কিন্তু আলোটা হঠাৎ নেমে গেছে কেন? জ্যোৎস্নারাত বলে আলোটা অনুজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওটা কত দূরে রয়েছে অনুমান করা যাচ্ছে না।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে হল, আলোটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। নিটোল গড়নের ছোট্ট একটা হলদে চাকার মতো। আমাদের অবাক করে সেটার আয়তন বাড়তে শুরু করল। তারপর একটা প্রকাণ্ড গোল জালার মতো আকার নিয়ে ঘুরতে থাকল বনবন করে। তুয়ারেজ-দুজন বিড়বিড় করে কী বলতে থাকল। কর্নেল চাপা গলায় এতক্ষণে বলে উঠলেন—মাই গুডনেস! ও কিসের আলো?

এবার আলোর জালাটার রঙ বদলাচ্ছে। লাল, নীল, বেগুনী, সবুজ রঙ ছড়াচ্ছে একের পর এক। সেই সঙ্গে বনবন করে চাকার মতো ঘুরছেও।

তারপর ওটা হঠাৎ অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। মনে হচ্ছে, কোনও পাহাড়ের মাথায় একটা ভূতুড়ে লাট্টু নিয়ে কোন অদৃশ্য দানব খেলা করছে। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বলে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! এ সেই উড়ন্ত চাকী নয় তো?

কর্নেল শুধু বললেন—চুপ্।

আলোটা এখন একটা বিশাল সোনালী বল হয়ে উঠেছে এবং স্থির হয়ে ভাসছে। কিন্তু একটা বিশেষ ব্যাপার এতক্ষণে আমার চোখে

পড়ল, আলোটার কোনও ছটা নেই যেন। আশেপাশের কোনও জিনিসে তার ছটা পড়ছে না।

আমরা নিষ্পলক তাকিয়ে আছি প্রত্যেকে। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছি বুঝি। চারপাশের নিস্তব্ধতায় ফিকে হলুদরঙের একফালি চাঁদ বিষণ্ণ আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু বাতাস হঠাৎ কখন বন্ধ হয়ে গেছে। যেন কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে বলে প্রকৃতি মুহূর্ত গুনছে।

সোনালী আলোর বলটা ফের এক লাফে আকাশের আরও উঁচুতে উঠে গেল। তারপর তাকে খুব ছোট্ট দেখাল। একটা ক্রিকেট বলের মতো। তারপর আরও ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল দূর দিগন্তে।

তুয়ারেজরা হাঁটু দুমড়ে বসে সম্ভবত প্রার্থনা করছিল। এবার ব্যস্তভাবে উঠে দুর্বোধ্য ভাষায় মুরাদকে কিছু বলল।

মুরাদ দোভাষীর কাজ করছে। সে কর্নেলকে বলল—কর্নেল! ওরা বলছে আমাদের সঙ্গে আহাজ্জারে যাবে না।

কর্নেল বললেন—সে কী!

—হ্যাঁ কর্নেল। ওই আলোটা দেখে ওরা বেজায় ভয় পেয়েছে। বলছে, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব না। বিপদ হবে।

কর্নেল কী জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় দেখলুম—তুয়ারেজ-দুজন আচমকা তাদের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল এবং যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। আবছা জ্যোৎস্নায় তাদের মূর্তি দ্রুত মিলিয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেকক্ষণ শোনা যেতে থাকল।

কর্নেল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি। এবার বললেন—মুরাদ, ওরা যে সত্যি সত্যি চলে গেল।

মুরাদ হাসল। ওর দাঁত চকচক করে উঠল জ্যোৎস্নায়।—হ্যাঁ কর্নেল, ওরা পালিয়ে গেল।

কর্নেল বললেন—তাহলে আহাজ্জারে পৌঁছনো কঠিনই হবে দেখছি। এ তো ভারি ঝামেলায় পড়া গেল!

আমি কিন্তু মনে-মনে খুশিই হলুম। হিরণ মামার জন্যে মনের ভেতর সারাক্ষণ ঝড় বইছে। এবার যদি আলগোলেয়া শহরে ফেরা হয়, তাহলে স্বস্তি পাব।

কর্নেল আমার কাছে এগিয়ে কাঁধে হাত রেখে বলে উঠলেন—টিটো কি মুষড়ে পড়েছ?

হাসবার চেষ্টা করে বললুম—না তো! মুষড়ে পড়ার কী আছে? ওটা সেই উড়ন্ত চাকী বা 'সসার' ছাড়া কিছু নয়।

কর্নেল বললেন—কে জানে! তবে 'আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা ইউ. এফ. ও.—সংক্ষেপে যাকে বিজ্ঞানীরা 'উফো, বলেন, তা এই প্রথম চাক্ষুষ করা গেল। টিটো, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর নানা দেশে এই 'উফো' চালু করা হয়েছে। প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানীরও বিশ্বাস, মহাকাশের সুদূর এলাকা থেকে মানুষের চেয়ে আরও বুদ্ধিমান জীবেরা মহাকাশযান পাঠিয়ে আমাদের পৃথিবীর খোঁজখবর নেয়। ওইসব অদ্ভুত আলো সেই মহাকাশযান। যাক্‌গে, আমার এই এক বিদঘুটে স্বভাব। আগাগোড়া খুঁটিয়ে যাচাই করা পর্যন্ত ওসব উড়ো ব্যাপারে বিশ্বাস করি না।

কর্নেল হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন। ঘোড়াগুলো ভারি শিক্ষিত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমূর্তির পাথুরে ঘোড়ার মতো। মুরাদ হাসানের সঙ্গে চাপা গলায় কী কথা বলছে। এতক্ষণে ফের বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসটা আগের চেয়ে ঠাণ্ডা মনে হল। কর্নেলকে বললুম তাহলে কি আলগোলেয়া ফিরে যাব আমরা?

কর্নেল দ্রুত জবাব দিলেন—মোটেও না।

—কিন্তু পথ কে চেনাবে?

কর্নেল তাঁর ঘোড়ার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—চিন্তার কারণ নেই টিটো। আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে। এস এবার আমিই দলের গাইড। মুরাদ!

মুরাদ বলল—বলুন কর্নেল!

—উঠে পড়ো। রওনা দিই।

—রাস্তা তো আমি চিনি না।

—আমি চিনি।

—এঁ্যা!

—ম্যাপ আছে আমার কাছে।

—তাহলে তুয়ারেজদের সাহায্য চাইতে মিছিমিছি···

—সেটা ওদের ঘোড়াগুলোর জন্যে। ভুলে যেও না, ঘোড়া আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে না বলেই ওরা নিজেরা প্রস্তাব দিয়েছিল, আহাজ্জারে নিয়ে যাবে।

মুরাদ নিঃশব্দে ঘোড়ায় উঠল। হাসানও উঠল। মালবাহী ঘোড়াগুলোকে সামনে রেখে আমাদের যাত্রা শুরু হল আবার। এখন কর্নেলই পথপ্রদর্শক।

পথের অবস্থা একই রকম। কখনও সমতল প্রান্তর এবং বড়বড় পাথর ছড়ানো রয়েছে, কখনও বালিয়াড়ি বা কাঁকুরে রুক্ষ মাটি। মাঝে মাঝে ছোট-বড় টিলার মধ্যে দিয়ে চলেছি। চাঁদ ফিকে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। সেই আবছা আলোয় কদাচিৎ কী যেন জন্তু দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কখনও। হাসান বলল—ওগুলো একজাতের মরুহরিণ। বুঝতে পারলুম না, এই নীরস পাথুরে এলাকায় ওরা কী খেয়ে বেঁচে আছে।···

ভোর হতে-হতে আমরা যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে সামনে বিশাল উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পাহাড় পেরুতে হবে ভেবে আঁতকে উঠলুম। ঢুলুনির ঘোর কেটে গেল। তারপর কর্নেলের গলা শোনা গেল—মুরাদ!

—বলুন কর্নেল!

—কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছ কি?

—হ্যাঁ। গন্ধকের গন্ধ।

—মুরাদ, মনে হচ্ছে গতরাতে আলোটা আমরা এখানেই দেখেছিলুম।

—আমরা তো মনে হচ্ছিল, খুব কাছেই ছিল আলোটা।

—চোখের ভুল। যাকগে, ম্যাপে দেখেছি, এই পাহাড় শ্রেণীর নাম ওহারা রেঞ্জ। এই রেঞ্জের ওপারে আহাজ্জার অঞ্চল। এবার কোথাও নিরাপদ জায়গায় বিশ্রাম করা যাক্। তারপর দরিপথটা খুঁজে বের করতে হবে।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে কী দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন—পশুপালকদের একটা আস্তানা রয়েছে ওখানে। কুয়োও

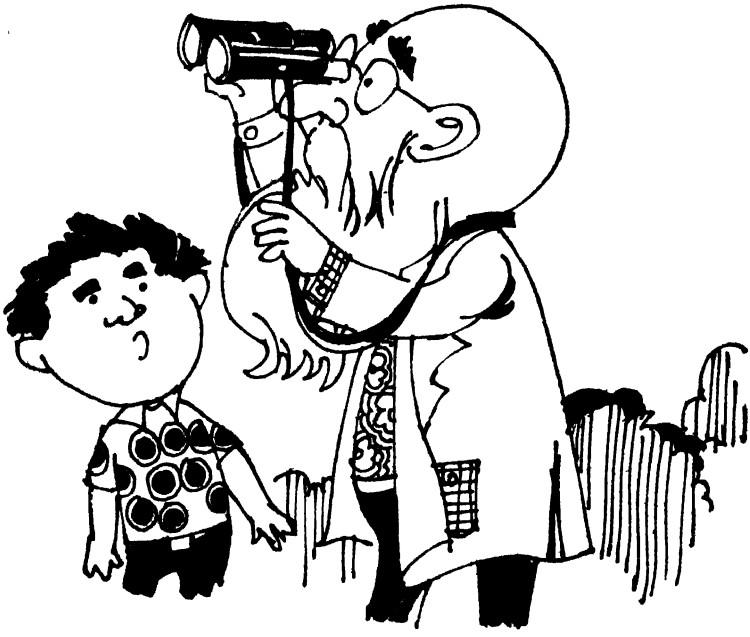

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে কী দেখতে থাকলেন।

আছে। ওখানেই যাওয়া যাক্। ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে হবে।

বালি, বড় বড় পাথর, কাঁটাঝোপে ভর্তি এই পাহাড়তলীতে গন্ধকের গন্ধ টের পাচ্ছিলুম আমিও। কিন্তু উপায় নেই। এই গন্ধের মধ্যেই কিছুক্ষণ কষ্ট করে কাটাতে হবে। খাড়া পাহাড়ের নীচে দিয়ে পশু-চলাচলের পথ। সেই পথে কিছুটা এগিয়ে দুটো টিলার মাঝখানে

একটা ছোট্ট উপত্যকায় পৌঁছলুম। যেখানে কাঠের বেড়ায় ঘেরা বিশাল একটা খোঁয়াড় রয়েছে। সেই খোঁয়াড়ের একপ্রান্তে অনেকগুলো চামড়ার তাঁবু। কিন্তু কোনও লোক নেই।

তারপর একটা ব্যাপার দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলুম। খোঁয়াড়ে কয়েকশো ভেড়া চার ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও অনেকগুলো মরা ভেড়া কেউ যেন একসঙ্গে স্তূপের মতো জড়ো করে রেখেছে।

বেড়ার ওপর ঝুলন্ত একটা কুকুরের মড়াও দেখতে পেলুম। মুরাদ বলে উঠল—এ কী কর্নেল! জন্তুগুলো মারা পড়ল কিসে?

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—তাই তো! তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন।

ততক্ষণে অনেকটা ফর্সা হয়ে গেছে। পুবের আকাশে লাল ছটা খেলছে। কর্নেল বেড়ার ধারে গিয়ে ভেতরটা দেখার পর বললেন—তোমরা যেমন আছ, তেমনি থাকো। ঘোড়া থেকে কেউ নেমোনা। আমি আসছি।

কর্নেল খোঁয়াড়ের বেড়ার ধারে-ধারে এগিয়ে চললেন তাঁবুগুলোর দিকে।

এই সময় লক্ষ্য করলুম, আমাদের ঘোড়াগুলো খুব নড়াচড়া শুরু করেছে। গা ঝাঁকা দিচ্ছে। সবগুলো ঘোড়াই এরকম করছে। গন্ধকের গন্ধটা তো আছেই।

কর্নেল একটা তাঁবুর মধ্যে উঁকি দিচ্ছেন তখন। তারপর দেখি, উনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। এদিকে ঘোড়াগুলোকে সামলানো যাচ্ছে না। মালবাহী ঘোড়াগুলো মুখ ঘুরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে-করতে কয়েক পা এগোলে মুরাদ তাদের সামলাতে গেল।

অবস্থা দেখে ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল!

কোনও সাড়া এল না। শ দেড়েক মিটার তফাতে তাঁবুগুলো রয়েছে খোঁয়াড়ের অন্য প্রান্তে। কয়েকটা ক্ষয়াখর্বুটে গাছ ও ঝোপঝাড় রয়েছে সেখানে। একটা কুয়োও দেখা যাচ্ছে।

মুরাদ ঘোড়াগুলোকে একটু তফাতে রেখে এল। শুধু তাই নয়, নিজের ঘোড়াটাও সে ওখানে একটা কাঁটাঝোপে বেঁধে রেখে এসেছে। এসে বলল—ভারি আশ্চর্য তো! ওখানে ওরা চুপ করে আছে দেখতে পাচ্ছ?

বললুম—হ্যাঁ। এই খোঁয়াড়ের কাছে কী আছে?

মুখের কথা শেষ হতেই আমার ঘোড়াঠা বিকট চিঁহি করে চার ঠ্যাং তুলে লাফিয়ে উঠল। আমি ছিটকে পড়লুম। উঠতে-উঠতে দেখি, হাসানও তখন মাটিতে চিৎপাত হয়েছে। দুটো ঘোড়াই দৌড়ে যাচ্ছে। কর্নেলের ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে থরথর করে কাঁপছে! কাঁপতে-কাঁপতে হঠাৎ ধপাস করে গড়িয়ে পড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল! আমি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ফের চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল!

মুরাদ ব্যস্তভাবে বলল—হাসান! হাসান! তুই ওই ঘোড়াগুলোকে আরও তফাতে নিয়ে যা। অনেকটা দূরে। আর এস টিটো, আমরা তাঁবুগুলোর ওখানে যাই। কর্নেলের সাড়া নেই কেন দেখে আসি।

হাসান দৌড়ে ঘোড়াগুলোর কাছে চলে গেল। আমি ও মুরাদ চললুম তাঁবুগুলোর দিকে। মুরাদ বলল—দেখ, দেখ! তিনটে কুকুর জড়াজড়ি করে মরে পড়ে রয়েছে!

একটা তাঁবুর সামনে তিনটে কুকুর বীভৎস ভাবে মরে পড়ে আছে। ফের ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

এতক্ষণে ওপাশের একটা তাঁবুর ভেতর থেকে কর্নেলের সাড়া এল—এখানে আছি।

সেই তাঁবুর দরজায় উঁকি মেরে আবছা অন্ধকারে কিছু ঠাহর হল না। মুরাদ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল—কী ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেল বললেন—ভেতরে এস।

তাঁবুর ভেতর ঢুকে কয়েক মুহূর্ত পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। দেখলুম,

শয্যাশায়ী একটা লোকের মাথার কাছে বসে আছেন কর্নেল। লোকটা বুড়ো। অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

কর্নেল তাকে কী একটা ট্যাবলেট চোষাচ্ছেন। বুড়ো কিন্তু খুব আনন্দেই সেটা চুষছে। একটু পরে সে ইশারায় জল খেতে চাইল। মুরাদ ঝটপট কোণায় রাখা একটা জালা থেকে জল তুলতে গেলে কর্নেল ধাক্কা দিয়ে বললেন—না মুরাদ। ও জল এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে। বরং তোমার ফ্লাস্কের জল দাও।

মুরাদ ফ্লাস্কটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই দিল। মরু অঞ্চলে বড় সহজে নিজের জল অন্যকে দেওয়া যায় না। বুড়ো পশুপালক অনেকটা জল ঢকঢক করে খেয়ে এবার সুস্থ লোকের মতো উঠে বসল। তারপর আমাদের তিনজনের মুখের দিকে তাকাতাকি করতে থাকল।

মুরাদ দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে কী বলল। জবাবে বুড়োও কিছু বলল। এভাবে কিছুক্ষণ ওরা কথা বলার পর কর্নেল বললেন—কী ব্যাপার মুরাদ? কী বলছে ও?

মুরাদ বলল—কর্নেল! এই মেষপালক বলছে, গতরাতে ওহারা পাহাড়ের ভূতটা এসে হানা দিয়েছিল। ভূতটা নাকি আগুনের গোলার মতো। হাঁ করলে দরজা খুলে যায়, আর ভেতর থেকে একটা মস্তোবড়ো ফড়িং অনেকগুলো হাত আর ঠ্যাং বের করে এগিয়ে আসে।

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—ফড়িং?

—তাই তো বলল। প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় নাকি ওহারা পাহাড়ে ভুতটা এসে হানা দেয়। তবে কোনোবারই সে বুড়োর জন্তুগুলোর ক্ষতি করেনি। এবার কেন এরকম সর্বনাশ করে গেল বুড়ো বুঝতে পারছে না।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, বুড়ো পশুপালক এই সময় উঠে বাইরে চলে গেল। আমরাও বেরিয়ে গেলুম। তারপর দেখি, লোকটা দুহাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে। মুরাদ তাকে তার ভাষায় সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করল না।

কর্নেলকে দেখলুম, সামনের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললুম—কিছু বুঝতে পারলেন কর্নেল ?

উনি জোরে মাথা দোলালেন। তারপর মুরাদের উদ্দেশে বললেন—তুমি ঠিক বলছ তো মুরাদ যে ও তোমাকে একটা ফড়িঙের কথাই বলল ?

মুরাদ বলল—তাই তো বলল। আরও বলল কী জানেন ? ওই ফড়িংটাই নাকি এ তল্লাটের সব পঙ্গপালের রাজা। প্রতি গ্রীষ্মে ফড়িং-রাজ আসে প্রজাদের খোঁজখবর নিতে। আর প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে যায়। তখন ওরা দূর-দূরান্তের দেশে ফসলের ক্ষেতে গিয়ে হানা দেয়।

আমি বলে উঠলুম—যাঃ। এ অবিশ্বাস্য !

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—টিটো ! এই পৃথিবীতে এখনও অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। সাধারণ বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক, এখানে মিছিমিছি সময় কাটিয়ে লাভ নেই। আমরা বরং ওহারা পাহাড়ের দিকেই যাই।

কর্নেল পকেট থেকে ওঁর সেই ম্যাপটা বের করলেন ! মুরাদ বলল—ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

কর্নেল ম্যাপটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—মুরাদ। ম্যাপে যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে, ওহারা পাহাড়ের ওপিঠেই সেই রহস্যময় প্রস্রবণ—যেখান থেকে ইলি নদীর উৎপত্তি। ইলি নদীর সঙ্গে দক্ষিণ সাহারার কিছু নদীর যোগ আছে। তাই একটা বিশাল এলাকা জলাভূমি হয়ে উঠেছে। আমরা ইলি নদী ধরে এগোলেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব।

মুরাদ ভয় পাওয়া গলায় বলল—কিন্তু, বুড়ো যে ভূতটার কথা বলল, তাকে আমরাও তো স্বচক্ষে দেখেছি কর্নেল। তাই বলছি, ওহারা পাহাড়ে যাওয়া কি উচিত হবে ?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—স্বচক্ষে এও তো দেখেছি মুরাদ, আলো-ভূতটা দূরের আকাশে মিলিয়ে গেল। দেখিনি কি ?

মুরাদের মুখ দেখে মনে হল, তবু ও সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু কর্নেল চলতে শুরু করলে সে অগত্যা পা বাড়াল। আমিও ওদের অনুসরণ করলুম। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলুম না। একটা সোনালী আলোর গোলক, এবং তার দরজা খুলে প্রকাণ্ড একটা ফড়িংয়ের বেরিয়ে আসা···

হাসানের চিৎকারে সম্বিত ফিরল। সে অনেকটা তফাতে ঘোড়াগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখি, সে ঘোড়াগুলোকে তাড়া করে কী বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ুচ্ছে। কর্নেল ও মুরাদ দৌড়ে গেলেন। আমিও। যাবার সময়, কর্নেলের মরা ঘোড়াটাকে ডিঙিয়ে গেলুম। সেই সঙ্গে পিছু ফিরে একবার দেখেও নিলুম, হতভাগ্য পশুপালক তখনও দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অতগুলো ভেড়া মরে বেচারা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এতক্ষণে বুঝলুম, কেন হাসান অমন করে পালাচ্ছে। কখন চুপিসাড়ে এদিকে-ওদিকে বড় বড় পাথরের ওপর শকুনের ঝাঁক এসে বসে আছে। শকুনগুলোর হাবভাবে হিংস্রতা ফুটে বেরুচ্ছে। ধূসররঙের সেই অতিকায় শকুনদের মাথাটা গাঢ় লাল। ঠোঁটগুলো বাঁকা এবং গাঢ় হলুদ রঙের। আর পাথরের নীচে বা আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে আছে শেয়ালের মতো দেখতে, অথচ শেয়ালের চেয়ে প্রকাণ্ড, একদল জানোয়ার। তাদের জিভ লকলক করছে।

খোঁয়াড়ের মরা জন্তুগুলো সাবাড় করতেই ওরা এসেছে বোঝা গেল। কিন্তু কীভাবে ওরা টের পেল, সেটাই ধাঁধা।

কর্নেলের ডাকাডাকিতে হাসান দূরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়াগুলোও যেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। মুরাদ গিয়ে থাপ্পড় তুলে হাসানকে মারতে যাচ্ছিল, কর্নেল বাধা দিলেন। হাসান কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল—আর একটু হলেই আমাকে আর ঘোড়াগুলোকে খেয়ে ফেলত না বুঝি?

মুরাদ চোখ পাকিয়ে বলল—তোমাকে রাইফেল দেওয়া হয়েছে কেন আহাম্মক?

এবার হাসানের চমক ভাঙল। পিঠে বাঁধা রাইফেলটায় হাত ছুঁয়ে সে ফিক করে হেসে বলল—ইস্! ভুলেই গেছি। আমি এতক্ষণ তেষট্টা শকুন আর চৌদ্দটা নেকড়ে মেরে ঢিট করে দিতে পারতুম।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে ওহারা পাহাড়ের দিকে কী দেখতে দেখতে বললেন—আশ্চর্য! পাহাড়টার মাথা যেন পুড়ে কালো হয়ে আছে। সেই সোনালী আলো-ভূতটা সত্যি বড্ড সাংঘাতিক। যাক্ গে, চলো—আমরা এবার ওদিকেই যাই।

ততক্ষণে সূর্য বিশাল লাল গোলার মতো উঁকি দিচ্ছে। রুক্ষ মরু আর পাথরের ওপর লালচে ছটা খেলছে। পা বাড়িয়ে সূর্যটাকে পিছু ফিরে ফের দেখতে গিয়ে চমকে উঠলুম। দূর দিগন্তে কালো একটা চলমান কিছু চোখে পড়ল। বললুম—কর্নেল! কর্নেল! দেখুন তো ওটা কী?

কর্নেল ঘুরে বাইনোকুলারে জিনিসটা দেখে নিয়ে বললেন—একটা জিপ আসছে।

॥ আট ॥

পাথরের আড়ালে আমরা লুকিয়ে পড়েছিলুম। কারণ সাহারায় নানা মতলবে বদমাস লোকেরা ঘুরে বেড়ায়। আইন কানুনের বালাই নেই। তার ওপর সরকারী লোকেদের পাল্লায় পড়লেও বিস্তর ঝামেলা সইতে হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপটা এসে পড়ল। সামনাসামনি প্রায় আমাদের নাকের ডগায় এসে গতি কমাল। অমনি চমকে উঠলুম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। জিপের ড্রাইভার আর কেউ নয়, হরিণমারা ফার্মের সেই মুকুন্দ।

তবে তার বিদঘুটে ছাগলদাড়িটা আর নেই। পরনে একেবারে সামরিক পোশাক যেন। কোমরে পিস্তল ঝুলছে। এ কি স্বপ্ন?

জিপে আরও দুজন বসে আছে। একজনের চোখে সানগ্লাস, মুখে দাড়ি। কপাল অব্দি টুপিতে ঢাকা। অন্যজনের শরীর দেখে দানব বলেই মনে হল। তার রঙটা কুচকুচে কালো। মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর। থ্যাবড়া নাক। লোকটা যে নিগ্রো, তাতে কোনও ভুল নেই।

জিপটা হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মুকুন্দ একলাফে নেমে একটু দূরে সেই খোঁয়াড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে ফিসফিস করে বললুম—কর্নেল! এই সেই মুকুন্দ—যার কথা আপনাকে বলেছিলুম। হিরণমামার ফার্মে ট্রাকটার চালাত।

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন। ঘোড়াগুলো আমাদের পেছনে রয়েছে এবং পাথরগুলো প্রকাণ্ড উঁচু বলে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরে রয়েছে জিপটা।

এবার মুকুন্দ বলল—কালীদা! মনে হচ্ছে ব্যাটারা আমাদের ভুল রাস্তা বাৎলেছে।

ফের চমকে উঠলুম। সানগ্লাসপরা দাড়িয়াল লোকটা জিপ থেকে নামল। মুকুন্দ তার নাম ধরে না ডাকলেও এবং নকল দাড়ি থাকলেও চিনতে ভুল হত না। এ যে দেখছি সেই শয়তান কালিকিংকর!

কিন্তু তার তো এখনও পৌঁছবার কথা নয়! যে জাহাজে পৌঁছবার কথা, তা আসতে এখনও ঢের দেরী। এত শিগগির

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন। [পৃঃ ৮৭

পৌঁছল কীভাবে? আর হিরণমামাকে কোথায় রেখে এল? ওর পোষা গরিলাটাই বা কোথায়?

কালিকিংকর সানগ্লাস খুলে চোখে বাইনোকুলার লাগাল। তারপর বলল—মুকুন্দ! ওখানে অত জানোয়ার মরে পড়ে আছে কেন হে?

মুকুন্দ বলল—তাই তো! এতক্ষণ ভাবছিলুম, রাজ্যের শকুন আর নেকড়ে কেন ওখানে জড়ো হয়েছে?

কালিকিংকর বলল—হুঁ, বড্ড আশ্চর্য! শকুন আর নেকড়েগুলো

কিন্তু মরা জানোয়ারগুলোকে যেন পাহারা দিচ্ছে। খাচ্ছে না। লক্ষ্য করেছ মুকুন্দ ?

—করেছি। কেন খাচ্ছে না। বলুন তো ?

—চলো। দেখে আসি কী ব্যাপার।

ওরা তক্ষুণি জিপে উঠে বসল। তারপর জিপটাকে খোঁয়াড়ের দিকে যেতে দেখলুম। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দিল জিপটা। কিছুক্ষণ সব ঢাকা পড়ল।

কর্নেল বলে উঠলেন—সর্বনাশ। খোঁয়াড়ের লোকটা নিশ্চয় আমাদের কথা বলে দেবে।

বললুম—কিন্তু কালিকিংকর কীভাবে এত শিগগির এসে পড়ল, বলুন তো কর্নেল ? ওদের জাহাজ পৌঁছতে তো ঢের দেরী।

কর্নেল বললেন—মনে হচ্ছে, পথেই কোনও বন্দরে নেমে কালি-কিংকর দলবল নিয়ে প্লেনে রওনা দিয়েছিল। যাক্‌গে, ওরা এখান থেকে সরে না গেলে আমরাও আপাতত বেরুতে পারছিনে। এটাই সমস্যা।

মুরাদ ও হাসান কৌতূহলী হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুরাদ বলল—কী ব্যাপার স্যার ?

কর্নেল সংক্ষেপে তাকে সবটা বুঝিয়ে বললেন। খোঁয়াড়ের দিকে তাকিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকলুম। দেখলুম, কর্নেল যা বলছিলেন, তাই হল। পশুপালকের সঙ্গে কথা বলার পর ওরা দ্রুত জিপে উঠল। তারপর ওহারা পাহাড়ের দিকে ধুলোর ঝড় তুলে এগোল।

কর্নেল পকেট থেকে ম্যাপটা বের করেছেন। বললেন—আহাজ্জারে পৌঁছুবার একটা ঘুরপথ আছে। কিন্তু···

হঠাৎ কর্নেলের কথা কেড়ে মুরাদ বলে উঠল—কর্নেল ! একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—কী কথা মুরাদ ?

—ছেলেবেলায় বাবার কাছে এই পাহাড়টার অনেক গল্প শুনেছি।

বাবার পশমের ব্যবসা ছিল। আহাজ্জার এলাকা থেকে ভেড়ার লোম কিনে নিয়ে যেতেন। বাবা ওহারা পাহাড়ের একটা সুড়ঙ্গপথের কথা বলতেন।

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—সুড়ঙ্গপথ!

মুরাদ বলল—হ্যাঁ কর্নেল! বাবা বলতেন, সুড়ঙ্গপথটার কথা খুব কম লোকেই জানে। তাঁর এক বন্ধু চিনিয়ে দিয়েছিল। সুড়ঙ্গ-পথটা নাকি হাজার-হাজার বছরের পুরনো। প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা। এমন চওড়া যে পাশাপাশি দুজন ঘোড়সওয়ার ছুটে যেতে পারে। নাক বরাবর সোজা সেটা।

কর্নেল মাথা দুলিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাহারার এই সুড়ঙ্গ-পথটার কথা আমি একটা পুরনো কেতাবে পড়েছি বটে। এইমাত্র মনে পড়ল। তবে সে নাকি নিছক কিংবদন্তী।

মুরাদ জোর গলায় বলল—না কর্নেল। কিংবদন্তী নয়। বাবার কাছে আমি শুনেছি। বাবা মাঝে মাঝে ওই পথে যাতায়াত করতেন। তবে···

—তবে কী মুরাদ?

—বাবা বলতেন, পথটা যে না চেনে, সে মাথা ভাঙলেও খুঁজে বের করতে পারবে না।

কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন—এক কাজ করা যাক্। রোদ বাড়লে খুঁজে বেড়ানো কঠিন হবে। তার চেয়ে বরং এখনই রওনা হওয়া যাক্।

আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল! কালিকিংকরা যে ওদিকেই গেল!

—যাক্ না। আমরা সাবধানে এগুবো।···বলে কর্নেল পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলুম। ঘোড়াগুলো ডাকিয়ে নিয়ে হাসান ও মুরাদ বেরুল। তারপর আমরা চলতে শুরু করলুম। কর্নেল মালবাহী একটা বলিষ্ঠ ঘোড়ার পিঠেই চড়লেন। ওঁর হতভাগ্য ঘোড়ার লাসটা সেই খোঁয়াড়ে পড়ে রয়েছে।

চলতে চলতে লক্ষ্য করলুম, মুকুন্দরা যা বলছিল, তাই। শকুন আর নেকড়ের পাল কিন্তু মরা ভেড়া আর ঘোড়াগুলোকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে না। গন্ধকের কটু গন্ধ তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বোঝা যায়, মহাকাশ থেকেই হোক আর এই পৃথিবীর কোনও দুর্গম অজ্ঞাত জায়গা থেকেই হোক—যে আলোর গোলাটা এখানে হানা দিয়েছিল, তার প্রভাবে মড়াগুলোও অখাদ্য হয়ে গেছে শকুন ও নেকড়েদের কাছে।...

কালিকিংকরদের জিপ গাড়িটা যেন উবে গেছে। পাহাড়শ্রেণীর কোথাও এতটুকু ধুলো ওড়া দেখতে পাচ্ছি না। রুক্ষ ন্যাড়া পাথুরে মাটি এবং জায়গায়-জায়গায় লাল কাঁকরভরা বালিয়াড়ি পেরিয়ে একসময় ওহারা পাহাড়ের ধারে পৌঁছলুম। কোথাও খাড়া পাথর তিন শত মিটার দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও কিছুটা ঢালু এবং সেখানে ক্ষয়াখর্বুটে কাঁটাঝোপ গজিয়ে আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে কর্নেল সম্ভবত জিপের চাকার দাগ খুঁজে বেড়ালেন। তারপর বললেন—আশ্চর্য! ওরা গেল কোন পথে?

ওঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতে আচমকা আমাদের একটু তফাতে ধুলো উড়িয়ে দিল একঝাঁক রাইফেলের গুলি। তক্ষুনি আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। বেচারা ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। বোঝা গেল, গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে ওরা অভ্যস্ত। তুয়ারেজরা ভীষণ বন্দুকবাজ, তাও শুনেছি।

কয়েকমিনিট কেটে গেল। কিন্তু আর গুলি ছুড়ল না অজ্ঞাত আততায়ীরা। আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পর আমরাও রাইফেল বাগিয়ে জবাব দেবার জন্য তৈরি হয়েছি।

এই সময় মাথার ওপর পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি মূর্তি দেখতে পেলুম। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে হাত নেড়ে কী বলাবলি করছে। তারপর দেখি, তাদের একজন সামনে কিছু

এগিয়ে একটা চাতালের ওপর দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে কী একটা বলল।

অমনি মুরাদ উঠে দাঁড়িয়ে আরবীভাষায় কী জবাব দিল।

তারপরই লোকটাকে চিনতে পারলুম। ও তো সেই বিপ্লবী নেতা বিলকাদ! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—হাই বিলকাদ!

॥ নয় ॥

বিলকাদের দাঁতগুলো উজ্জ্বল রোদে ঝলসে উঠল। সে হাসতে হাসতে হাত নেড়ে বলল—হাই হিন্দু টিটো!

একটু পরে বিলকাদ সদলবলে নেমে এল। ওদের ঘোড়াগুলো এমন বিদঘুটে পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে ওস্তাদ। জনা বিশেক অনুচর নিয়ে বিপ্লবী বিলকাদ আমাদের চারদিকে রাইফেল উঁচিয়ে ঘোড়াসুদ্ধ চক্কর দিল। ফের কয়েক ঝাঁক গুলি ছুড়ল আকাশে। এই তার আনন্দের প্রকাশ সম্ভবত। ধুলোয় আমরা প্রায় ঢাকা পড়লুম। তারপর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়সওয়াররা। বিলকাদ নেমে এসে আমাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিল দু-হাতে। কী অসম্ভব গায়ের জোর লোকটার।

তারপর আমার গালে চটাস্ করে স্নেহের চুম্বন দিয়ে মাটিতে নামাল। বুঝলুম, ওঁর মরা ছেলের কথা ভেবেই আমাকে এত আদর করছে লোকটা।

মুরাদ কর্নেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এতক্ষণে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলুম, কর্নেল আরবীভাষা মোটামুটি জানেন। বিলকাদের সঙ্গে জমিয়ে তুললেন। কিন্তু বিলকাদের দৃষ্টি আমার ওপর সব সময়। কথার ফাঁকে-ফাঁকে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে সে আমার উদ্দেশেও স্নেহে ভরা কিছু কথা ছুড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু রোদ ক্রমশ চড়া হচ্ছে। বিলকাদ এবার ফরাসীভাষায় কর্নেলকে কী জিগ্যেস করল। কর্নেল দেখলুম বহুভাষাবিদ একেবারে। সাহারার এ তল্লাটের মালিক ছিলেন একসময় ফরাসী সরকার। তাই ইংরেজির চেয়ে ফরাসীই বেশি লোকে বোঝে। বিলকাদ মাতৃভাষার মতো ফরাসী বলতে পারে দেখলুম।

বিলকাদ আমাদের ছাড়বে না। ওহারা পাহাড়ে এক গুপ্ত

ঘাঁটি আছে ওর। সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন না করে ছাড়বে না। অগত্যা ওদের সঙ্গে আমরা রওনা দিলুম। পাহাড়ের ঢালু অংশটায় ওঠার অসুবিধে নেই। আমাদের ভাড়াকরা তুয়ারেজ ঘোড়াগুলো পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। শুধু আমারই যত কষ্ট। ঘোড়ার পিঠে কখনও পাহাড়ে চড়িনি। ঘোড়ার গলা দুহাতে জড়িয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে করে বসে রইলুম। হাসান আমার অবস্থা দেখে মুচকি-মুচকি হাসছিল। ছেলেটাএত আমুদে ভাবা যায় না।

পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিতে-নিতে অসংখ্য চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রায় দুহাজার ফুট উঁচুতে একটা গুহার সামনে পৌঁছলুম। তখন আমার গা ঘামে চব্‌চব্‌ করছে।

গুহাটা প্রকাণ্ড। বিলকাদের আরও কয়েকজন অনুচর সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। গুহার ভেতরটা অন্ধকার। তাই দিন-দুপুরে একটা পেট্রোমাক্স জ্বালানো রয়েছে। সৈনিকদের যেমন বিছানাপত্তর থাকে, তেমনি বিছানা রয়েছে সার-সার। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের সরঞ্জামও প্রচুর রাখা আছে। রীতিমতো দুর্গ। শুনলুম, বিলকাদের এমন ঘাঁটি অনেকগুলো রয়েছে নানা দুর্গম জায়গায়।

আমরা ওর অতিথি। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলতে থাকল। গুহার দরজার দুপাশে দুটো লালরঙের পতাকা টাঙানো হয়েছে। ওটাই বিলকাদের বিপ্লবীদলের জাতীয় পতাকা। সে কর্নেলের সঙ্গে ফরাসীভাষায় সম্ভবত তার বিপ্লবী নীতি নিয়ে কথা বলতে থাকল। আমি আর হাসান গুহার সামনে একটু তফাতে পাথরের একটা চাতালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম-দক্ষিণে বহুদূরের সমতল এলাকা দেখছিলুম। হাসান বলল—ওদিকেই নাকি আহাজ্জার। তার ওপাশে দক্ষিণ এলাকাটা পুরো সবুজের দেশ।

ধূসর দিগন্তের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছি আর হিরণমামার কথা ভাবছি, হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের ডানদিকে নীচে একটা দরিপথে কালিকিংকরের জিপটা যাচ্ছে। কর্নেলকে ডেকে আনতে-আনতে জিপটা পাহাড়ের খাঁজে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিলকাদও দৌড়ে এসেছিল। কর্নেল তাকে জিপটার কথা বললেন। বিলকাদ তার দুজন অনুচরকে তক্ষুনি কী হুকুম দিল। তারা ঘোড়ায় চেপে পাথর ডিঙিয়ে যেভাবে দৌড় লাগাল, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

রোদ চড়া বলে গুহায় ঢুকে পড়লুম একসময়। কিছুক্ষণ পরে বিলকাদের অনুচররা ফিরে এসে জানাল, জিপগাড়িটা বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে। পাথরে চাকার দাগ ওরা খুঁজেই পায় নি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল, বিলকাদ আর মুরাদকে নিয়ে বেরুলেন। বলে গেলেন, সুড়ঙ্গপথটার খোঁজে যাচ্ছেন। বিলকাদও সুড়ঙ্গপথটার কথা শুনেছে। কিন্তু খুঁজে পায় নি। তাই ওর ভারি উৎসাহ।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। সারারাত জেগে কেটেছে। ক্লান্তিও খুব। গুহার ভেতর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। স্বপ্নে দেখলুম, হরিণমারার মাঠে হিরণমামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত পাখি ডাকছে। কত ফুল ফুটেছে। প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ কোবরেজমশাই কোত্থেকে এসে বেজায় মুখ ভেংচাতে শুরু করলেন আমাকে। অমনি শ্রীমান ঢাকু ঘেউঘেউ করে তাড়া করল। হাসতে থাকলুম।

হাসানের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বলল—ও টিটো। তুমি হাসছিলে কেন?

মন খারাপ হয়ে গেছে স্বপ্নটা দেখে। গম্ভীর মুখে বললুম—ও কিছু না।

গুহার ভেতর কালো। যেন চিরকালের রাত। বাইরে বিকেলের রোদ খেলছে। বেরিয়ে গিয়ে চাতালটায় দাঁড়ালুম। হাসান চুপিচুপি বলল—এই টিটো! তখন দেখলুম, ওখানে অনেক খরগোস বেড়াচ্ছে! চলো না, খরগোস মেরে আনি গোটাকতক।

খরগোস মারার চাইতে একটু ঘোরাঘুরি করতে ইচ্ছে করছিল। স্বপ্নে হিরণমামাকে দেখে মন বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। কর্নেলরা

তখনও ফেরেন নি। রাইফেলটা নিয়ে দুজনে বেরুচ্ছি, একজন বিপ্লবী ভাঙা ইংরেজিতে বলল—ওহে খোকারা! এই অবেলায় যাচ্ছটা কোথায়?

বললুম—খরগোস মারতে।

—উঁহু। যেও না। ওহারা পাহাড় বড় খারাপ জায়গা। বিপদে পড়বে। ভূতপ্রেত আছে।

অমনি শ্রীমান ঢাকু ঘেউঘেউ করে তাড়া করল। [পৃঃ ৯৫

হাসান বুড়ো-আঙুল নেড়ে হাসল। আমি বললুম—আমাদের এত ভীতু ভেবো না।

লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। হাসানকে নিয়ে আমি পশ্চিমের ঢালু বেয়ে নামতে থাকলুম। নীচে মালভূমির মতো জায়গাটায় ঘন ছায়া পড়েছে। তার ওপাশে পাহাড় ধাপে-ধাপে নেমে একটা উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সেখানটা ইতিমধ্যে

অন্ধকার হয়ে উঠেছে যেন। হাসান ওখানেই খরগোসের পাল দেখেছে।

ঘুমের ফলে শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। পাথরের ধাপে ধাপে এবং ছোটবড় অজস্র পাথরের আড়াল দিয়ে আমরা উপত্যকায় নেমে এলুম। যতটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল, তত কিছু নয়। তবে এখনই ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। অবাক হয়ে দেখলুম, সামনের খাড়া দেয়াল গড়িয়ে প্রপাতের মতো একফালি জলধারা ঝরে পড়ছে অতল খাদে। আবছা ঝমঝম শব্দ কানে ভেসে আসছে। উপত্যকায় ঝোপঝাড় আর দু একটা করে গাছও রয়েছে। ঝর্নার পিছনে আকাশে ঢুঁ মেরেছে ওহারার সবচেয়ে উঁচু চূড়াটা। তিনকোণা ওই চূড়ার মাথা সাদা। বরফ জমে আছে বোঝা গেল। তাহলে ঝর্না বা নদীর সৃষ্টি সেই বরফগলা জল থেকেই।

খরগোস একটাও দেখতে পেলুম না। হাসান নিরাশ হয়ে বলল—আশ্চর্য তো! গেল কোথায় ব্যাটারা?

বলেই সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ওই দেখ, একটা খরগোস!

তারপর হাঁটু দুমড়ে বসে রাইফেল তাক করে গুলি ছুড়ল। চারদিকে পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় আওয়াজটা হল কামানের গর্জনের মতো। খরগোসটা আমি দেখতে পাইনি। হাসান চেঁচিয়ে উঠল—পড়েছে! পড়েছে। তারপর দৌড়ুল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। হাসান ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু গেল তো গেলই, আর ফেরার নাম নেই। পাহাড়ের মাথায় জ্বলজ্বলে রোদ।

কিন্তু এখানে অন্ধকার ঘনিয়েছে আরও। একটু পরেই আর কিছু দেখা যাবে না হয়তো। সঙ্গে টর্চও আনিনি। চেঁচিয়ে ডাকলুম—হাসান! হাসান!

কোনও সাড়া পেলুম না। ফের কয়েকবার ডাকাডাকি করলুম। তবু ওর সাড়া নেই। তখন খুব ঘাবড়ে গেলুম। কোনও বিপদে পড়েনি তো হাসান?

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলুম। ঝোপগুলো কাঁটায় ভরা। ততক্ষণে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সাবধানে পা ফেলছি আর ডাকছি—হাসান! হাসান! কোথায় তুমি?

একটু দূরে চাপা গোঙানি শুনলুম যেন। ফের চেঁচিয়ে উঠলুম—হাসান! হাসান!

তারপরই চাপা গর্জন কানে এল। থমকে দাঁড়ালুম। সিংহ নয় তো? সাহারায় একসময় অসংখ্য সিংহ ছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। তবে দু একটা সিংহ কি দৈবাৎ থাকতে পারে না? হাসান নিশ্চয় সিংহের কবলে পড়েছে।

হঠাৎ নাকে একটা বোটকা গন্ধ ভেসে এল। গন্ধটা খুব চেনা মনে হল। তারপর চাপা গর্জন শুনলুম একেবারে কাছাকাছি। আবছা আঁধারে চোখে পড়ল, কালো একটা মূর্তি আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, এ নিশ্চয় কালিকিংকরের সেই পোষা গরিলাটা। তাই ওর গায়ের গন্ধ এত চেনা মনে হচ্ছে। রাইফেল তাক করলুম সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু অমনি কে পেছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে আমাকে সে নিরস্ত্র করে ফেলল এবং দুহাতে শূন্যে তুলল। বুঝতে ভুল হল না, এ সেই কালিকিংকরের জিপে দেখা দানবাকৃতি নিগ্রো লোকটা। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—বিলকাদ! বিলকাদ! কর্নেল!

আমার মুখে তার থ্যাবড়া হাত পড়ল। কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারলুম না। লোকটা হ্যা হ্যা করে বিকট হেসে বলল—ওহে মুকুনডো! এই নেংটি ইঁদুরটা যে বিলকাদকে ডাকছে।

মুকুন্দের গলা শুনতে পেলুম একটু তফাতে।—দেখো বোম্বোভায়া, ওকে যেন সত্যিসত্যি ইঁদুর ভেবে টিপে ধরোনা। কর্তা ক্ষেপে যাবেন।

—বড্ড ঠ্যাং ছুড়ছে যে। দেব নাকি হাঁটুটা ভেঙে?

—আরে না না! খবর্দার ভায়া! মুকুন্দ হাসতে হাসতে বলল। একেবারে ছেলেমানুষ কি না! একটু তেজীও বটে। তাই বলে বেচারাকে খোঁড়া করে দিও না যেন।

রাগে দুঃখে বলতে ইচ্ছে করল—নেমকহারাম মুকুন্দ! তখন যদি তোর পরিচয় জানতুম!

বোম্বো আমাকে চ্যাংদোলা করে চড়াই-উৎরাই ভাঙছে। আমার মুখে তার প্রকাণ্ড হাতটা চাপা দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে কালিকিংকরের আওয়াজ শুনতে পেলুম।—পাখি জালে পড়েছে মুকুন্দ?

—হ্যাঁ কালীদা! মুকুন্দ বলল। এবার খোকাবাবুকে কাতুকুতু দিয়ে কথা আদায় করে নিন, ওর মামাবাবুটির খবর কতটা জানে। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে ভেগে নিশ্চয় হিরণবাবু আলগোলেয়া হাজির হয়েছিল। কর্নেল বুড়োর সঙ্গে জুটে থাকলে তো বড় ভাববার কথা কালীদা। তাই না?

এই বিপদের মধ্যেও আমার আনন্দ হল কথাটা শুনে। হিরণ-মামা তাহলে সত্যি পালাতে পেরেছেন শয়তানদের কবল থেকে।……

॥ দশ ॥

ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে নিগ্রো বোম্বো আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল। পেছনে চাপা গলায় শয়তান কালিকিংকর আর মুকুন্দ কথা বলতে বলতে আসছে। দেঁতো গরিলাটার বোটকা গন্ধ সমানে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে মনে হল রাস্তাটা নীচে নামছে।

এবার নীচে একটা আলো দেখতে পেলাম। আলোয় কয়েকটা ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। দেখামাত্র আশা জাগল, ওরা যদি আমাদের দলের কেউ হয়!

কিন্তু তক্ষুনি পেছন থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল এবং নীচের একটা ছায়ামূর্তিও টর্চ জ্বেলে কী যেন সংকেত করল। বুঝলুম, ওরা কলিকিংকরেরই লোক।

হুঁ, আগেভাগে যোগাড়যন্তর করে রেখেছে সব। বোম্বো আমাকে নামিয়ে দিয়ে দাঁত বের করে ইংরেজিতে বলল—ওহে খোকা! পালাবার চেষ্টা না করে এবার ভালছেলের মতো চুপচাপ জিপে ওঠ দিকি!

ছোট্ট পেট্রোম্যাক্স বাতির আলোয় দেখা গেল, কালিকিংকরের জিপটা রয়েছে। জিপের কাছে জনা চার এদেশী লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লম্বা আলখেল্লার মতো পোশাক। মাথায় টুপি। টুপির সঙ্গে পাগড়ি জড়ানো। পিঠে রাইফেল রয়েছে প্রত্যেকের। একটু তফাতে চারটে ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আলোর ছটায় তাদের চোখগুলো নীল হয়ে জ্বলছে।

জিপের পেছনে গরিলাটাকে ঠেলে তুলে দিল কালিকিংকর। তারপর বোম্বোকে কী ইশারা করল। বোম্বো আমার কাঁধে হাত রেখে বলল—কই গো খোকামণি! এবার ভালছেলের মতো ওঠ দিকি!

মুকুন্দ বলল—কর্তামশাই! বরং আগে এই ক্ষুদে বিচ্ছুটার কাছে জেনে নিলে ভাল হত, ওর মামা কোথায় আছে।

কালিকিংকর হাতের ঘড়ি দেখে নিয়ে কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, আমি বলে উঠলুম—মামার সঙ্গে আমাদের দেখাই হয়নি!

কালিকিংকর থাপ্পড় তুলে বলল—চোপরাও! আগে আমাদের ডেরায় চলো, তারপর খাঁটি কথা আদায় করে নেব। বোম্বো আর শ্রীমান জুম্বা এ ব্যাপারে ওস্তাদ। সত্য বলছ, না মিথ্যা—ওরা ঠিক টের পায়!

আমার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকল। বোম্বো আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জিপের পেছনে ঢোকাল। আতকে উঠে দেখি কোণায় একটা টায়ারের ওপর গরিলাটা বসে আছে। দাঁত বের করে যেন হাসছে। আর সেই বিশ্রী দুর্গন্ধ ওর গায়ের!

বোম্বো বিকট হেসে বলল—কী খোকাবাবু, ভয় করছে বুঝি? ভয়ের কিছু নেই। জুম্বা আমার দোস্ত। আমায় চটিও না। তাহলে জুম্বাও চটবে না।

গুটিসুটি বসে রইলুম। বোম্বো আমার পাশে বসল। কালিকিংকর চাপা গলায় আরব লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলছিল। একটু পরে ওরা ঘোড়ায় চেপে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মুকুন্দ পেট্রোম্যাক্স বাতিটা নিবিয়ে জিপের ভেতর রাখল। তারপর সে ড্রাইভারের জায়গায় এসে বসল। কালিকিংকর তার ডাইনে বসল। গাড়ি চলতে থাকল। হেডলাইটের আলোয় দেখলুম, একটা পাহাড়ী খাতের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। রাস্তা বলতে কিছু নেই। জিপ নড়বড় করে চলছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাচ্ছি। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে, সিট থেকে ছিটকে পড়ব ওই ভয়ংকর গরিলাটার গায়ে। এবং সত্যি পড়লে কী হবে, তা জানি। কোবরেজ মশাইয়ের সেই সাংঘাতিক পরিণতি তো আজও ভুলতে পারিনি! আমি নিজের অজানতে বোম্বো হারামজাদাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলুম। তবে নিগ্রো দৈত্যটার তাতে আপত্তি দেখলুম না। বরং সে আমাকে ধরে রইল

একহাতে, যেন আচমকা লাফ দিয়ে পড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করি!

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল বেচারা হাসানের কথা! তার কী হল? সে এই বদমাসদের পাল্লায় পড়েনি তা বোঝাই যাচ্ছে। সম্ভবত হঠাৎ গিয়ে গরিলাটার পাল্লায় পড়েছিল এবং···

সর্বনাশ! জুম্বা ওকে মেরে ফেলেনি তো?

মন খারাপ হয়ে গেল। এদিকে জিপটা টাল খেতে খেতে এগোচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে উল্টে যাবে। কালিকিংকরও বলে উঠছে—সাবধান মুকুন্দ! সাবধান! গরিলাটাও চাপা গজরে উঠছে বারবার।

দুঃখে আতঙ্কে চোখ বুজে এল। কতক্ষণ পরে জিপ থামল, বলা কঠিন। চোখ খুলে দেখি, মুকুন্দ নেমে গেল। হেড লাইটের আলোয় সামনে বড় বড় পাথরের চাই দেখা যাচ্ছে। মুকুন্দ বলে উঠল—কর্তামশাই! মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে রাস্তা।

কালিকিংকর ব্যস্তভাবে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। তারপর টর্চের আলোয় সেটা খুলে দেখতে লাগল। হুঁ, কর্নেলের মতো একটা ম্যাপ এনেছে ব্যাটা।

ম্যাপটা দেখার পর সে নেমে গিয়ে বলল—না মুকুন্দ। রাস্তা ভুল হয়নি। তোমারই চোখের ভুল। মনে পড়ছে না, সেবার এসে আমরা ভূমিকম্পের পাল্লায় পড়েছিলুম এখানে? ওই তো সেই লাল পাথরের খাড়া দেয়াল। ওই দেখ, সেই সাদা রঙের গোলক আঁকা রয়েছে দেয়ালে।

কালিকিংকর টর্চের আলো ফেলেছে। দেখে অবাক হয়ে গেলুম, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল রয়েছে। গাঢ় লাল রঙ সেটার। আর তার গায়ে বিশাল একটা সাদা গোলক আঁকা। কে বা কারা ওখানে সাদা গোলক এঁকেছে?

মুকুন্দ চিন্তিত মুখে বলল—কিন্তু কর্তা, যদি সুড়ঙ্গটা ধসে গিয়ে থাকে সেই ভূমিকম্পে?

কালিকিংকর বলল—দেখে আসি, চলো! বোম্বো, আমরা আসছি। সাবধান!

মুকুন্দ জিপের হেডলাইট নিবিয়ে দিয়ে কালিকিংকরের সঙ্গে চলে গেল। আবার ঘন অন্ধকার নেমে এল। গরিলাটার সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় ঝিমোচ্ছে। বোম্বোরও মনে হচ্ছে, ঢুলুনি চেপেছে। এবার পালাবার একটা সুযোগ এসেছে। শুধু নিগ্রো দৈত্যটার হাতটা আমার কাঁধ থেকে সরাতে হবে।

বোম্বো বেজায় ঢুলতে শুরু করেছে। আমিও একটু করে ওর হাতটা আলগা করে দিচ্ছি। একটু পরে ওর হাতটা সিটের পিছনে ঠেকে রইল। আমি সামনে ঝুঁকে একটু সরে এলুম সাবধানে। তখন বোম্বোর নাক ডাকছে।

পালাতে হলে আমাকে এই সিটের পেছনে অর্থাৎ জিপের সামনের দিকে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে পড়তে হবে এবং সেখান থেকে লাফ দিলেই মাটি পেয়ে যাব। কিন্তু জিপের ছাদ নীচু। ওইটুকু ফাঁক গলিয়ে সামনের সিটে যেতে বোম্বো জেগে যাবে। বুকের কাঁপন বেড়ে গেল। ডান হাত বাড়িয়ে মুকুন্দের জায়গাটা ছুঁয়ে আনন্দ হল। আমার রাইফেলটা ওর হাতে ছিল। সিটের পেছনে লম্বা করে ফেলে রেখেছে। রাইফেলটা অটোমেটিক। সাবধানে হাতাতে হবে। নৈলে গুলি ছুটে যাবে।

বোম্বো নাক ডাকিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে এল। সাবধানে ওকে সরিয়ে দিলাম। তখন অন্যপাশে ঝুঁকে মাথাটা চিতিয়ে পা দুটো বাড়িয়ে দিল। ভাগ্যিস জুম্বার গায়ে ঠেকেনি! নৈলে জুম্বা নিশ্চয় গর্জন করত।

এবার নিঃশব্দে কাত হয়ে সিটের মাথা দিয়ে নিজেকে গলিয়ে সামনের সিটে পড়লুম। একটু শব্দ হল। এক সেকেণ্ডের জন্যে নিগ্রোটার নাকডাকা থামল। দম বন্ধ করে রইলুম। ফের নাক ডাকা শুরু হলে পা বাড়িয়ে মাটিতে রাখলুম। তারপর রাইফেলটা টেনে নিলুম।

আর আমাকে পায় কে? এবার ইচ্ছে করলেই বোম্বো আর জুম্বার খুলি ফুটো করে দিতে পারি।

রাইফেল সতর্কভাবে ধরে হাঁটু গেড়ে জিপের পেছনে গেলুম। তারপর উঠে দাঁড়ালুম। মুক্তির আনন্দে মন নেচে উঠল। কালিকিংকরদের আলো দেখছি না কোথায়ও। ওরা কি তাহলে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে? কোন সুড়ঙ্গ? একি সেই সুড়ঙ্গ পথ, যার খোঁজে কর্নেল মুরাদ ও বিলকাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন?

অন্ধকারে ঠাহর করে কিছুটা তাকাতে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লুম। অজানা পাহাড়ী এলাকায় কীভাবে বিলকাদের সেই আড্ডায় ফিরে যাব জানি না। তাছাড়া সেখান থেকে ঠিক কতদূরে এসে পড়েছি, তাও জানি না। এতক্ষণে ঘড়ির কথা মনে পড়ল। ঘড়িটা ভাগ্যিস ভাঙেনি ধস্তাধস্তিতে। রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা চকচক করছে। দেখি, রাত সা'ড়ে দশটা!

সর্বনাশ! তাহলে কি আমি জিপে আসার সময় বেশ কয়েকঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলুম? নাকি আচমকা এই বিপদের মধ্যে পড়ে সময়জ্ঞান লোপ পেয়েছিল?

প্রায় পাঁচঘণ্টা হল বিলকাদের ডেরা থেকে বেরিয়েছি। জিপটা যদি ঘণ্টায় এক কি.মি. গতিতে এসে থাকে, তাহলে সাড়ে চার-পাঁচ কি.মি. দূরে চলে এসেছি।

কিন্তু রাস্তা বলতে তো কিছুই নেই যে নিশ্চিন্তে ফিরে যাব— যত অন্ধকার হোক! বড্ড ভাবনায় পড়ে গেলুম। অন্তত টর্চটা থাকলে সাহস পেতুম!

দুর্ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, হঠাৎ দেখলুম কালিকিংকরদের টর্চের আলো জ্বলে উঠেছে একটু দূরে। ওরা কথা বলতে বলতে ফিরে আসছে। আর এখানে থাকা এতটুকু নিরাপদ নয়। মরীয়া হয়ে জিপটা থেকে দূরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম। হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে বাঁদিকে এগিয়ে পাথরের চাতাল মতো পেলাম। চাতালটা মসৃণ। নক্ষত্রের আলোয় এতক্ষণে ঠাহর হচ্ছে সব।

রাজপথের মতো লম্বা চাতালটা ঘুরে-ঘুরে চলেছে। একটু পরে দেখি, মাথার ওপর বা চারপাশে আকাশে নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি কোনো গুহায় ঢুকে পড়েছি?

যা থাকে বরাতে, গুহাতেই রাতের আশ্রয় নিতে হবে। সকাল হলে রক্ষে। আরও একটু এগিয়ে মসৃণ পাথরের ওপর বসে পড়লুম।

বসে থাকতে থাকতে এবার ঘুমে চোখ ভারি হয়ে গেল। তখন পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ শুয়েছিলুম কে জানে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি, খানিকটা দূরে সাদা আলোর ছটা ঝলকে উঠল। তারপর গম্ভীর গুরুগুরু মেঘের গর্জন শুরু হল। তাহলে কি ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ? এই সাহারা মরু অঞ্চলে?

পরক্ষণেই বোঝা গেল, ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ নয়—অন্য কিছু ঘটছে। প্রচণ্ড সাদা আলো দেখা যাচ্ছে দূরে এবং সেই আলোর ছটায় দেখতে পাচ্ছি, এটা গুহা নয়—একটা সুড়ঙ্গপথ। আর সেই মেঘের মতো গর্জনের বদলে এখন যেন হাজার-হাজার এরোপ্লেন উড়ছে বাইরের আকাশে।

আচম্বিতে গতরাতের সেই সোনালী গোলকটার কথা মনে পড়ে গেল! আবার কি সেই উড়ন্ত চাকীর আবির্ভাব ঘটল ওহারা পাহাড়ে?

তাহলে যে সেই পশুপালকের খোঁয়াড়ের হতভাগ্য প্রাণীগুলোর মতোই অবস্থা হবে আমার!

দিশেহারা হয়ে উল্টোদিকে সুড়ঙ্গপথে চলতে শুরু করলুম। আলোর ছটায় সুড়ঙ্গপথটা পরিষ্কার। উঁচু ছাদ আর দুপাশে মসৃণ দেয়াল।

আলোর ছটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। আর সেই গরগর হাজার প্লেনের গর্জন পেছনে যেন তাড়া করল। দৌড়তে থাকলুম। নিশ্চয় উড়ন্ত চাকীটা এই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছে। আমাকে বেঘোরে মারা পড়তে হবে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়চ্ছি, আর পেছনে কানে তালাধরানো একটানা ভয়ংকর যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে আসছে। যেন হাজার-হাজার চাকা একসঙ্গে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। পিঠে যেন উত্তাপ টের পাচ্ছি। গন্ধকের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে।

তারপর মাথাটা ঘুরে উঠল। টাল খেয়ে পড়ে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ কেউ চেঁচিয়ে উঠল আমার নাম ধরে—টিটো! টিটো!

দাঁড়িয়ে গেলুম। কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। বাঁপাশ থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে এসে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল।

মূর্তিটা যে হিরণমামার, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে টের পেয়েছিলুম।...

যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ খুলে দেখি একটা লণ্ঠন জ্বলছে পাথরের বেদীর ওপর। আমার সামনে বসে আছেন হিরণমামা আর তিনজন অচেনা আরব উপজাতীয় লোক। তাদের মুখে আতংকের ছাপ স্পষ্ট। বাইরে কোথাও চাপা যান্ত্রিক গর্জনটা শোনা যাচ্ছে।

উঠে বসলুম। দুহাতে হিরণমামা আমায় জড়িয়ে ধরে আদর করতে-করতে বললেন—তোর সঙ্গে আর ইহজীবনে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি টিটো! পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে এক নাবিকের সাহায্যে পালাতে পেরেছিলুম। তারপর তোদের খোঁজে কী কষ্টে মরুভূমির রাস্তায় একটা জিপ যোগাড় করে আলগোলেয়া পৌঁছলুম, কহতব্য নয়। প্রদীপশংকরের মুখে সব শুনে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছিলুম। তারপর...

বাধা দিয়ে বললুম—প্রদীপশংকর কোথায় মামা? তাঁকে তো দেখছি নে!

—প্রদীপ গেছে আহাজ্জারে একটা কাজে। কিছুক্ষণ পরে ফিরবে। এবার বল্, কর্নেল কোথায়? তুই বা এখানে একা কী করছিলি?

আগাগোড়া সব কথা খুলে বললাম। শুনে হিরণমামা বললেন—সকাল হতে আর ঘণ্টা দুই দেরী আছে। তারপর সব ব্যবস্থা হবে।

বাইরে চাপা যান্ত্রিক শব্দটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। শন্ শন্ খস্ খস্···অদ্ভুত আওয়াজ। যেন অসংখ্য পাখি ডানা মেলে উড়ে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। জিগ্যেস করলুম- ও কিসের শব্দ মামা!

হিরণমামা একটু হাসলেন। তারপর বললেন—সুড়ঙ্গপথে এখন একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটছে টিটো। যে উজ্জ্বল আলোর পাল্লায় তুই পড়েছিলি, ওহারা পাহাড়ের পতঙ্গরাও তার পাল্লায় পড়েছে। তবে

হিরণমামা আমায়-জড়িয়ে ধরে বললেন- তোর সঙ্গে আর ইহজীবনে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি টিটো। [পৃঃ ১০৬

তুই মানুষ বলে ভয় পেয়ে পালাচ্ছিলি। কিন্তু ওরা পতঙ্গ। আলো দেখলে হয়তো ওদের আনন্দ হয়। ওরা বোকার মত আলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর পুড়ে মরছে। এখন যে শব্দটা শোনা যাচ্ছে, ওটা পতঙ্গের ডানার শব্দ।

অবাক হয়ে বললুম—পতঙ্গ। কী পতঙ্গ মামা?

—আবার কী! সেই সিস্টেসার্কা গ্রেগারিয়া প্রজাতির ফড়িং। অর্থাৎ পঙ্গপাল। এই পঙ্গপালের পেটেই থাকে মারাত্মক মাদকদ্রব্য। যা নিয়ে চোরাকারবার করবে ভেবেছিল কালিকিংকর।

বলে হিরণমামা গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবতে থাকলেন। আরব লোকগুলো এতক্ষণে নড়ে বসল। তারপর একজন উঠে পা টিপেটিপে এগিয়ে গেল। এটা একটা গুহা বলেই মনে হচ্ছে। দরজার দিকে চৌকো পাথর আটকানো রয়েছে। লোকটা পাথরের একপাশে ফাটল দিয়ে উঁকি মেরে রইল।

ডাকলুম—মামা! আমরা কোথায় আছি?

হিরণমামা জবাব দিলেন—সুড়ঙ্গপথের পাশে একটা গোপন গুহায়। এই লোকগুলোকে প্রদীপশংকরের সাহায্যে খুঁজে বের করেছি। এরাই এই সুড়ঙ্গ আর এই গুহার খোঁজ রাখে। এরা কিন্তু সাংঘাতিক লোক। নিষিদ্ধ মাদক নিয়ে যে ইউরোপীয় দলটা চোরাকারবার করে, এরা তাদেরই এজেন্ট। অনেক টাকা দিয়ে এদের বশ করা হয়েছে। যাই হোক, আর আধঘণ্টা পরে সব ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখবি। বুঝতে পারবি। এখন চুপচাপ বিশ্রাম কর।

অগাধ রহস্যে তলিয়ে গেলুম। মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পেলুম না। পঙ্গপাল কি ওহারা পাহাড়েরই সুড়ঙ্গপথে লুকিয়ে থাকে—আরও গুহা বা ফাটলের খাঁজে? আলো দেখলে বেরিয়ে পড়ে এবং পুড়ে মরে! কিন্তু ওই আলোটা কি সত্যি উড়ন্ত চাকী? মহাকাশের সুদূর এলাকায় কোন অজ্ঞাত গ্রহের আজব প্রাণীদের ওই বুঝি একধরনের বিমান! সেই পশুপালক নাকি বলেছে, ওই সোনালী গোলকের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ফড়িংদের রাজা!

নাঃ, সবই আজগুবি ব্যাপার। কিছু বোঝা যায় না।

কতক্ষণ পরে হিরণমামা ডাকলেন—ওঠ্ টিটো! সময় হয়ে গেছে।

আরব তিনজন দরজার পাথর টানাটানি করে সরাল। তারপর আমরা বেরিয়ে গেলুম। সুড়ঙ্গপথে তেমনি ঘুরঘুট্টে আঁধার। কিন্তু

টর্চ জ্বলে উঠল হিরণমামা আর আরবদের হাতে। সেই আলোয় দেখলুম, এখন সুড়ঙ্গপথে খালি ছাই। রাশীকৃত ছাই। বিকট দুর্গন্ধ।

কালো ছাইয়ে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু ছাইগুলো কাদার মতো আঠালো। তারপর দেখি, আরব লোকগুলো লম্বা জোকার পকেট থেকে বোতল বের করেছে এবং পায়ে করে ছাইগাদা সরিয়ে কী তুলে নিয়ে বোতলে ভরছে। মামা আমার কানে-কানে বললেন—এই সেই মাদক! প্রচণ্ড নেশা হয় খেলে। আবার বিষও বটে। তাছাড়া ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। টিটো, ইচ্ছে করলে এখন আমরা লক্ষপতি হতে পারি। বুঝলি তো?···

কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকটা ফর্সা হয়ে এল ভোরের আকাশের মতো। হিরণমামা আমার হাত ধরে পা বাড়ালেন এবং পিছু ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় লোকগুলোকে কী বললেন। ওরা যেন শুনল না। আপন মনে ছাইগাদায় আলো ফেলে কী সব হাতড়াতে ব্যস্ত হল। হিরণমামা আমাকে নিয়ে জোরে চলতে থাকলেন। কিছুটা এগিয়ে আর টর্চের আলোর দরকার হল না। মামা এবার বলে উঠলেন—কেন চলে এলুম জানিস? ওই লোকগুলো আমাদের আক্রমণ করত।

চমকে উঠে বললুম—সে কী! কেন?

—ওরা সাংঘাতিক লোক। পাছে ওই মাদকদ্রব্যের ভাগ দিতে হয়, ওরা আমাদের নির্ঘাৎ মেরে ফেলত।

—আমার কাছে রাইফেল তো রয়েছে।

হিরণমামা হাসলেন।—আমার কাছে রিভলবারও আছে। কিন্তু ওরা দুর্ধর্ষপ্রকৃতির খুনে। নেহাৎ টাকার লোভে আমাকে এই সুড়ঙ্গের খবর দিয়েছে এবং সঙ্গে করে এনেছে। কিন্তু ওরা চুপি চুপি পরামর্শ করছিল, আমাকে সময়মতো মেরে ফেলবে। হয়তো ফেলত। কিন্তু হঠাৎ তুই এসে পড়লি। তোর কাছে রাইফেল রয়েছে। তাই দেখে সাহস পায়নি। রাইফেলকে ওরা বেজায় ভয় করে। ভক্তিও করে।

ক্রমশ পথ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর একটা বাঁক ঘুরেই আমরা সুড়ঙ্গপথের দরজায় পৌঁছলুম। বাইরে মুক্ত পৃথিবীতে এখন

উজ্জ্বল সকাল। রাতের বিভীষিকার চিহ্ন সহজে চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, কিছু ঝোপঝাড় আর গাছ ঝলসে গেছে। অজস্র খরগোস মরে পড়ে রয়েছে।

বাঁদিকে সেই নীরস পাথরের দেয়ালে সাদা গোলক আঁকা রয়েছে। কালিকিংকরদের জিপের খোঁজ করলাম। হিরণমামা চোখে বাইনোকুলার রেখে চারদিক দেখছিলেন। বললাম—মামা! দেখুন তো ওদের জিপটা আছে নাকি!

হিরণমামা বললেন—জিপ একটা দেখতে পাচ্ছি বটে। তবে সেটা প্রদীপশংকরের। আয়, আমরা এগিয়ে যাই।

এখন আর রাস্তাঘাট বলতে কিছু নেই। বোঝা যায়, ভূমিকম্পে সুড়ঙ্গপথের ছাদটা এখানে ধসে এই অবস্থা হয়েছে। শুধু পথটা আছে। এই মসৃণ চাতালের মতো পথেই কাল রাতে সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকেছিলাম।

নীচে নেমে গিয়েই এক সাংঘাতিক দৃশ্য চোখে পড়ল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে কালিকিংকরের জিপটা পুড়ে দুমড়ে রয়েছে। তার কাছে দেঁতো গরিলা জুম্বা দাঁত বের করে পড়ে আছে। আশ্চর্য, ওর গায়ে পোড়ার চিহ্ন নেই। উড়ন্ত চাকীর আলোর ছটা হয়তো বড় জন্তুদের পোড়াতে পারে না। তার বিষাক্ত গ্যাসে দম আটকে মারা পড়ে। পশুপালকের খোঁয়াড়ে আমরা দেখেছিলুম এ ব্যাপারটা।

গরিলাটার হাত পাঁচেক তফাতে নিগ্রো বোম্বো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হিরণমামা তাকে চিত করে শুইয়ে দিলেন। বোম্বো বেঘোরে মারা পড়েছে।

কিন্তু কালিকিংকর আর মুকুন্দ কোথায়?

প্রদীপশংকরের জিপ এসে গেল। প্রদীপশংকর নেমে সব দেখতে দেখতে বললেন—এ কী! কালীকাকার গরিলাটা মারা পড়ল কিসে?...

॥ এগারো ॥

প্রদীপশংকরের কথা শেষ হতে না হতে আচম্বিতে আমাদের আশেপাশে কয়েক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। আমরা তক্ষুনি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

হিরণমামা ফিসফিস করে বললেন—নিশ্চয় কালিকিংকর আর মুকুন্দ গুলি ছুড়ছে। কিন্তু ওরা বেঁচে গেল কীভাবে?

প্রদীপশংকর মুখে ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে বললেন—কালীকাকা একটা শয়তান! ওঁর মৃত্যু নেই। তবে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এখনই মরু-প্রহরীরা এসে পড়বে। ওদের খবর দিয়ে এসেছি।

হিরণমামা বললেন—কর্নেলসায়েবের খবর পেলেন?

—না। প্রদীপশংকর গম্ভীরমুখে জবাব দিলেন।—আহাজ্জার এলাকার কেউ বলতে পারল না।

আমি বললুম—কর্নেলের খবর কীভাবে পাবেন উনি? কর্নেল, মুরাদ আর বিপ্লবী নেতা বিলকাদ তো এই সুড়ঙ্গপথের খোঁজে বেরিয়েছিলেন কাল বিকেলে!

প্রদীপশংকর বললেন—সর্বনাশ! তাহলে হয়ত ওহারা পাহাড়ের মধ্যেই ঘুরে মরছেন এখনও।

হিরণমামা উদ্বিগ্নমুখে বললেন—আমার ভয় হচ্ছে, রাতের উড়ন্ত চাকীর পাল্লায় পড়েননি তো?

—উড়ন্ত চাকী মানে? প্রদীপশংকর অবাক হয়ে বললেন।

হিরণমামা বললেন—হ্যাঁ, উড়ন্ত চাকী। এতকাল বিশ্বাস করতুম না। এখন স্বচক্ষে সব দেখার পর সত্যি বলে মেনেছি। মহাকাশের কোন সুদূর এলাকার কোন গ্রহ থেকে একটা অদ্ভুত মহাকাশযান নিয়ে আসে সেখানকার প্রাণীরা। সাহারা মরুভূমির এই ওহারা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মুখে উজ্জ্বল মহাকাশযানটা এসে

দাঁড়ায়। আর তার আলোর দিকে ছুটে আসে লক্ষকোটি পঙ্গপাল ফড়িং—সিস্টেমার্কা গ্রেগারিয়ার ঝাঁক। পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আহাজ্জার এলাকার লোকেরা বরাবর বংশ-পরম্পরায় এ খবর রাখে। বিশেষ করে পোড়া ফড়িঙের পেট থেকে মহাকাশযানের ওই অপার্থিব রশ্মির গুণে একরকম মাদক তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। সাহসীরা বোতলে পুরে নিয়ে যায়।

প্রদীপশংকর বললেন—তাহলে যা-সব শুনেছি, সবই সত্যি।

—নিখাদ সত্যি।

এইসময় কোথায় ফের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। উঁকি মেরে দেখি, একটু দূরে উঁচুতে সুড়ঙ্গপথের কাছে চাতালে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেল তাক করে আছে অন্যদিকে। সূর্যের আলো পেছনের পাহাড়ের গলি দিয়ে এসে তাদের ওপর পড়েছে। চিনতে ভুল হল না। কালিকিংকর আর মুকুন্দ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম—মামা! মামা!

হিরণমামা আমার মুখে হাত চাপা দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন—মনে হচ্ছে কালিকিংকর আরেকদল আরবের সাহায্যে সুড়ঙ্গপথের হদিস পেয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের সেই আরব-তিনজনকে ওরা খুন করে ফেলে বোতলগুলো হাতিয়েছে হয়তো। কিন্তু……

বাধা দিয়ে বললুম—মামা, কাল চারজন আরব ঘোড়ায় চেপে ওর সঙ্গে এসেছিল এখানে।

—হুম্! তাহলে তাদেরও খুন করেছে কালিকিংকর!

প্রদীপশংকর বললেন—হিরণদা! মরু-প্রহরীরা আসছে মনে হচ্ছে। জিপের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না?

হ্যাঁ, দূরে আবছা গুরগুর শব্দ হচ্ছে। প্রদীপশংকর ফের বললেন—আমি পাথরের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে গিয়ে ওদের খবর দিই। আপনারা অপেক্ষা করুন।

হিরণমামা বললেন—সাবধানে যাবেন কিন্তু। ওদের নজরে

পড়লেই গুলি ছুড়বে। ভাইপো বলে খাতির করবে না কালিকিংকর।

প্রদীপশংকর পাথরের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন। আমার চোখ কালিকিংকরের দিকে। ওরা এখনও অন্যদিকে রাইফেল তাক করে আছে। কাদের দিকে? তারা কারা?

হিরণমামা বললেন—টিটো, আয়! আমরা ওই বড় পাথরটার পেছনে যাই। এ জায়গাটা সুবিধে মনে হচ্ছে না। ওরা একটু এগোলে আমাদের দেখতে পাবে।

আমরা পিছিয়ে গেলুম হামাগুড়ি দিয়ে। এদিকটা বালিতে ভরা। সাহারার বুকে ঝড়ের সময় ওহারা পর্বতমালার ভেতর বালি উড়ে এসে জড়ো হয়। বড় পাথরটা বালিতে ডুবে রয়েছে। তার আড়ালে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসা গেল। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওরা কোনোভাবেই আমাদের দেখতে পাবে না।

একটু পরে আমার পেছন দিকে কয়েকটা পাথরের মধ্যিখানে লালচে বালি হঠাৎ নড়তে শুরু করল। চমকে উঠলুম। মরুভূমির বালিতে একজাতের অজগর সাপ থাকে। নিশ্চয় সেই সাপ! রাইফেল বাগিয়ে ধরতেই হিরণমামা বললেন—কী রে টিটো?

—ওখানে বালিগুলো নড়ছে কেন মামা?

—এ্যাঁ! ও কী!

তারপর যা ঘটল, আমরা দুজনেই হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

একটা লালচেরঙের মূর্তি বালি ঠেলে উঠল। এবং চোখের পাতা পিটপিট করতে করতে কয়েকবার থুতু ফেলল। তারপর ফিক করে হাসল।

অমনি চেঁচিয়ে উঠলুম—হাসান! তুমি!

হাসান ওই ভূতুড়ে লালচে মুখে সাদা দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল—রাত্তিরটা আরামে কাটিয়েছি। শুধু দুঃখ, আমার রাইফেলটা হারিয়ে গেছে।

হিরণমামা হাসি চেপে বললেন—ওহে, তুমিই তাহলে সেই হাসান? টিটো তো তোমার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিল। যাক্ গে, সাবধান বাপু! দেখছ না, দুশমনরা তাক করে আছে। এখানে এসে চুপচাপ বসে পড়ো।

হাসান আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল—উঃ! তোমার জন্যে কী ভাবনায় না পড়েছিলুম টিটো!

বললুম—তোমার কী হয়েছিল কাল বলো তো? হঠাৎ তুমি উধাও!

হাসান বলল—ওখানটায় একটা কালো ভূত দেখেছিলুম, বুঝেছ? ভূতটা দেখেই পালাতে গিয়ে একেবারে গর্তে পড়েছিলুম। তারপর কী হয়েছিল মনে নেই। যখন জ্ঞান হল, উঠে বসলুম। কিন্তু হঠাৎ কানে এল ভয়ংকর আওয়াজ। তারপর সে-রাতের সেই সোনালী আলোর চাকাটা দেখতে পেলুম আকাশে। অমনি পড়ি-কী-মরি করে পালিয়ে এলুম ওখান থেকে। তারপর এই বালির খাদে ঢুকে বালিতে ঢাকা দিলুম নিজেকে।

—বল কী! দম আটকে যায় নি?

—মোটেও না। আমরা সাহারার ছেলেপুলে। গরীবগুরবোরা তো বটেই, এ তল্লাটে সবার এ অভ্যেস আছে। বালি মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিই।

হিরণমামা বলে উঠলেন—মরু-প্রহরীরা এসে পড়েছে!

পেছনে ঘুরে দেখি, বেশ কিছুটা দূরে পাথরের আড়ালে কয়েকটা মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল হেলমেটপরা সশস্ত্র সৈনিক এগিয়ে আসছে। প্রদীপশংকর ওদের কর্তার সঙ্গে কথা বলছেন মনে হল। তারপর দেখলুম, ওরা চার-পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে গেল। একেক দল একেক দিকে পাহাড় বেয়ে বা খাদে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল। কালিকিংকর আর মুকুন্দ টের পাচ্ছে না, ওদের ঘিরে ফেলা হচ্ছে তিন দিক থেকে।

হঠাৎ সেই নির্জন মরুপাহাড় কেঁপে উঠল লাউডস্পিকারের

আওয়াজে। মরুপ্রহরীদের কর্তাই লাউডস্পিকারে ইংরেজিতে বলে উঠলেন—বিদেশীরা! তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তোমরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করো। নৈলে এখনই তোমাদের শরীর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

কালিকিংকর ও মুকুন্দ চমকে উঠেছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে।

ফের মাইক্রোফোন গমগম করে প্রতিধ্বনি তুলল ওহারা পাহাড়ে। —বিদেশীরা! দশ গোনা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি তোমাদের। আত্মসমর্পণ করো—নয় তো মৃত্যু।···

কালিকিংকর ও মুকুন্দ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। হিরণমামা বললেন—নির্বোধ! ওরা নির্বোধ!

মাইকে আওয়াজ উঠল ফের—ওয়ান···টু···থ্রি···ফোর···

দেখলুম, মুকুন্দ রাইফেল ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে দাঁড়াল।

—ফাইভ···সিক্স···সেভেন···

হিরণমামা উত্তেজিত ভাবে বললেন—কালিকিংকর মরতেই চায় তাহলে!

—এইট···নাইন···টেন। ফায়ার!

চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির আওয়াজ। মরুপ্রহরীদের লক্ষ্য অব্যর্থ। মুকুন্দের একতিল ক্ষতি হয়নি। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কালিকিংকর···

তাকে দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে। পড়ে আছে চাতালের ওপর তার লাশ।

সৈনিকেরা দৌড়ে যাচ্ছে চাতালের দিকে। আমরাও এগিয়ে গেলুম। মুকুন্দকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে সৈনিকরা। আমাদের সামনাসামনি এসে বেহায়া মুকুন্দ একটু কাঁচুমাচু হেসে হিরণমামাকে বলল—নমস্কার স্যার! একটু দেখবেন! আর টিটো, ভাল তো খোকামণি? মামাবাবুকে একটু বোলো আমার হয়ে!

রাগে জ্বলেপুড়ে গেল ভেতরটা। ওরে শয়তান! কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি যা করেছ, এ জীবনে ভুলব বুঝি?

হাসান তার মুখের সামনে বুড়ো আঙুল নেড়ে বেজায় ভেংচি কাটল। তখন মুকুন্দও তাকে ভেংচি কাটল। সৈনিকরা তাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। হাসান হেসে খুন। হাসি আমারও পেল।

কিন্তু কালিকিংকর কোথায়? এ ভারি আশ্চর্য তো!

মরুপ্রহরীদের কর্তালোকটিও একজন আরব। প্রকাণ্ড চেহারা। বিশাল ভুঁড়ি। ভুঁড়িতে হাত বুলানো অভ্যেস। প্রদীপশংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো! উবে গেল নাকি?

হিরণমামা খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখছিলেন। এবার লাফিয়ে উঠে বললেন—বুঝেছি?

—কী, কী?

—এই যে দেখছেন, দেয়ালের নীচে মস্তো গর্ত। এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কালিকিংকর। আমার মনে হচ্ছে, এই গর্ত দিয়ে সুড়ঙ্গপথে পৌঁছনো যায়।

প্রহরীদের কর্তা চেঁচিয়ে আরবী ভাষায় কী আদেশ দিলেন। একদল সৈনিক সুড়ঙ্গপথের দিকে দৌড়ল। একটু পরেই তারা উধাও হয়ে গেল।

প্রদীপশংকর হিরণমামাকে বললেন—চলুন, আমরাও এগোই। সুড়ঙ্গপথটার কথা প্রাচীন যুগের ভ্রমণবৃত্তান্তে পড়েছিলুম। স্বচক্ষে দেখে আসি।

আমরা কয়েকপা এগিয়েছি, সামনে সুড়ঙ্গপথের দরজার কাছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম।

সৈনিকরা দুজন লোককে ঘিরে ধরে ফিরে আসছে। লোকদুটো মাথার ওপর হাত তুলে করুণ মুখে এগোচ্ছে।

না, কালিকিংকর নয়। স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আর মুরাদ!

কর্নেলের টুপিটি বগলদাবা। মাথার টাকে ছাই, সাদা দাড়িতে কালো ছাই—একেবারে নব্য যুবক যেন! ভেবেই পেলুম না, ওই বিচক্ষণ বুড়ো গোয়েন্দা ওখানে কী ভাবে ঢুকলেন, কখন ঢুকলেন!

হুঁ, বিলকাদ নিশ্চয় গতিক টের পেয়ে পালিয়েছে সদলবলে। ওর নামে সরকারী পরোয়ানা ঝুলছে গ্রেফতারের।

প্রদীপশংকর প্রহরীদের জাঁদরেল কর্তাটিকে সব বুঝিয়ে বলতেই কর্নেলরা ছাড়া পেলেন।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললেন—টিটো, এখানে কোথাও স্নানের জল পাওয়া যাবে বলতে পারো?

হিরণমামা হাসতে হাসতে এগিয়ে ওঁকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।—হ্যাল্লো কর্নেল! বহুকাল পরে দেখা! আসুন, আসুন—আপনার স্নানের জল আগে খুঁজে বের করি। তারপর কথা হবে।

হাসান বলল—ওদিকে একটা কুয়ো আছে দেখেছি!

কর্নেল হাসানের হাত ধরে ব্যস্তভাবে বললেন—চলো, চলো! এসব ছাইয়ে তেজস্ক্রিয়তা আছে। শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে!

আমরা চাতাল থেকে পাহাড়তলীতে নামতে থাকলুম।...

* * *

মরু-প্রহরীরা মুকুন্দকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। আমরা ওদের সঙ্গে আলগোলেয়া শহরে ফিরে যাই নি। সুড়ঙ্গপথ থেকে কিছুটা দূরে একটা পরিত্যক্ত কুয়ো আছে। হাসান নাকি কাল সন্ধ্যায় বিলকাদের দলের লোকের কাছে তার খোঁজ পেয়েছিল। কুয়োর জলটা ভারি সুন্দর। ওহারা পাহাড়ের আলো-ভূতের ভয়ে কবে পশুপালকরা কুয়োটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর কেউ সেখানে পা বাড়াতে সাহস পায় নি।

আমরা—কর্নেল, হিরণমামা, মুরাদ, প্রদীপশংকর, হাসান আর আমি সেখানে তাঁবু গেড়েছি। ঘোড়াগুলো বিলকাদের সেই ডেরায় বিশ্রাম করছিল। নিয়ে আসা হয়েছে। দুপুরে খাওয়া-

দাওয়ার পর কর্নেলের তাঁবুর ভেতর বসে কথাবার্তা হচ্ছে। কর্নেল নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন।

কাল বিকেলে কর্নেল, মুরাদ আর বিলকাদ সুড়ঙ্গের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ তাঁরা একটা গুহা দেখতে পান। গুহার দরজায় মানুষের পায়ের ছাপ দেখে তাঁদের কৌতূহল হয়। ওহারা পাহাড়ের সবখানেই বালি ছড়িয়ে রয়েছে। কারণ মরুভূমিতে ঝড় উঠলে বালি উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা জুড়ে। বালি গুহার ভেতরেও ঢুকে পড়ে। তাতে পায়ের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। যাই হোক, ওঁরা ভেতরে ঢুকে যান।

তারপর ওঁরা অবাক হয়ে দেখেন, গুহার ভেতরের দিকে একটা ফোকর রয়েছে। সেটা গলিয়ে যেতেই ওঁরা সুড়ঙ্গপথে পড়েন।

সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের আনন্দে তিনজনে এমন মেতে উঠেছিলেন যে তারপর আর সেই গুহাটা খুঁজে পান নি। অগত্যা তারা সুড়ঙ্গপথে চলতে শুরু করেন। বহুদূর যাওয়ার পর দেখা যায়, সুড়ঙ্গপথ শেষ। সামনের দিকটায় ছাদ ধসে পথ বন্ধ। তখন উল্টোদিকে আসতে শুরু করেন। সেই সময় আচম্বিতে তাঁদের ওপর হামলা করে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল।

হিরণমামা বললেন—পঙ্গপাল!

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আপনার গবেষণার পতঙ্গ সেই সিস্টেসার্কা গ্রেগারিয়া। হরিবল্! ভাবা যায় না! লক্ষ-লক্ষ, নাকি কোটি-কোটি ফড়িঙের ঝাঁক আচমকা অন্ধকারে আমাদের পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা আগাগোড়া পোশাকপরা ছিলুম। মুখও ঢেকে ফেললুম রুমালে। তখন বুদ্ধিমান মুরাদ চেঁচিয়ে উঠল—টর্চ নেভান! টর্চ নেভান! টর্চ নিভিয়েই খানিকটা রেহাই পেলুম।

প্রদীপশংকর বললেন—আলো দেখে ওরা ছুটে আসে কি না!

—হুম্! তখন বুঝতে পারলুম সাহারা মরুভূমির কুখ্যাত পঙ্গপালের ডেরাটা কোথায়। এই ওহারা পাহাড়ের প্রাচীন

সুড়ঙ্গের ভেতর ওরা বাস করে। মরশুম এলে তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে দেশ-দেশান্তরে। সারা আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে চলে যায় উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বদিকে—সেই ইরান থেকে পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে ভারতের রাজস্থান-পাঞ্জাব! কোথায় না যায়? যেখানে যায়, সবুজ ফসল আর গাছপালা ধ্বংস করে দেয়। ঘাস পর্যন্ত থাকে না। মরুভূমির এই পতঙ্গরা সবখানে মরুভূমি তৈরি করে ফেলে। বড় ভয়ংকর ওদের স্বভাব!

হিরণমামা হাসতে হাসতে বললেন—তাহলে উড়ন্ত চাকীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত! মাঝে-মাঝে সুদূর মহাকাশের অজ্ঞাত গ্রহ থেকে তারা এসে পঙ্গপালগুলোকে ধ্বংস না করলে এতদিনে এই সবুজ সুফলা পৃথিবী কবে চাঁদের মতো প্রাণহীন মরু হয়ে যেত!

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ হিরণবাবু। আপনাকে উদ্ধার করতে সাহারায় এসে এইটাই আমার বড় আবিষ্কার।

হিরণমামা ফের হেসে বললেন—তাহলে আসুন, আমরা উড়ন্ত চাকীরূপী দেবতার পুজো দিই ঘটা করে। করযোড়ে প্রণাম করে বলি, হে অজ্ঞাত গ্রহের দেবাদিদেব·····

হিরণমামার কথায় বাধা পড়ল। বাইরে থেকে হাসান গুলতির মতো ছুটে তাঁবুতে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল—সর্বনাশ! সর্বনাশ! পালিয়ে যান সবাই, পালিয়ে যান!

হকচকিয়ে উঠেছিলুম সবাই। সে-মুহূর্তে মুরাদও চেঁচিয়ে ডাকল—কর্নেল! কর্নেল! বাইরে আসুন শিগগির!

বেরিয়ে যেতেই চমক লাগল। ওহারা পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় এবং সুড়ঙ্গপথের দিকটায় ঘন কালো মেঘ নেমে আসছে বুঝি! তারপর অস্বাভাবিক একটা শনশন আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা মুহূর্তে-মুহূর্তে বেড়ে হাজার-হাজার প্লেনের গর্জনের মতো শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল হুকুম দিলেন—তাঁবু গুটোও! তাঁবু গুটোও!

সবাই হাত লাগিয়ে তিনটে তাঁবু গুটিয়ে ফেললুম। ঘোড়ার

পিঠে সব মালপত্র চাপানো হল। হাসান ও মুরাদ ঘোড়াগুলো নিয়ে তক্ষুনি দৌড় লাগাল। আমরা প্রদীপশংকরের জিপে চেপে বসলুম।

ওহারা পাহাড়ের পঙ্গপালের ঝাঁক যেন রক্তবীজ। উড়ন্ত চাকীর আগুনে তাদের বংশনাশ হয়নি। আরও হাজারকোটি সিস্টেসার্কা গ্রেগারিয়া বেঁচে আছে সুড়ঙ্গের গভীরে। হঠাৎ তারা কী কারণে বেরিয়ে পড়েছে! মারমুখী হয়ে তেড়ে আসছে মেঘের মতো। আকাশ-দিগন্ত কালো হয়ে গেছে। যেন লক্ষ প্লেনের গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে।

জিপ ঘুরিয়ে হঠাৎ প্রদীপশংকর বলে উঠলেন—কালীকাকা! কালীকাকা!

দেখলুম, একটা মূর্তি টলতে টলতে আসছে। আছাড় খাচ্ছে। গড়াগড়ি দিচ্ছে। ফের উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আর তাকে আক্রমণ করেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে ক্রুদ্ধ পতঙ্গ।

প্রদীপশংকর জিপ থেকে নামতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁর হাত ধরে টেনে বললেন—আপনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন প্রদীপশংকর? শিগগির এখান থেকে না গেলে আমরাও মারা পড়ব পঙ্গপালের হাতে।

প্রদীপশংকর ভাঙ্গা গলায় বললেন—কিন্তু কালীকাকা?

অপরাধী শাস্তি পাক! তাছাড়া এখন ওঁকে বাঁচানো অসম্ভব।

আমাদের জিপ চলতে শুরু করল। এতক্ষণে পঙ্গপালের ঝাঁক আমাদের লক্ষ্য করেছে। এগিয়ে আসছে বিশাল প্রসারিত কালো মেঘের মতো। জিপ জোরে চলতে থাকল। পেছন থেকে সমুদ্রগর্জনের মতো ভয়ংকর একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছে আর আসছে।

একবার ঘুরে দেখার চেষ্টা করলুম হতভাগ্য কালিকিংকরকে। দেখতে পেলুম না। কোটি কোটি ক্রুদ্ধ পতঙ্গ তাঁকে ঢেকে ফেলেছে।...

শেষ